অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
নৃসিংহ রহস্য

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
নৃসিংহ রহস্য

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

নৃসিংহ রহস্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে এই প্রজেক্টকে আরো অনেকটা এগিয়ে নেবার জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কোন ডোনেশন চাই না আমরা। আপনার দেওয়া অর্থর জন্য আমরাও কিছু দিতে চাই আপনাদের।
অনুগ্রহ করে www.dlobl.org তে অংশগ্রহণ করুন। অংশগ্রহণ ফি প্রতিমাসে মাত্র ৩০ টাকা। যার বিনিময়ে আপনি প্রতিমাসে পাবেন বড়দের উপযোগী ৪ (চারটি) বই। আপনার দেওয়া এই অর্থ দিয়ে তৈরী হবে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রতিমাসের মাত্র ৩০ টাকাই দিতে পারে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ইন্টারনেট দুনিয়া। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আপনিও আমাদের এই পথচলায় সামিল হোন। সকলে মিলে এগিয়ে চললে, আমাদের পথচলা মসৃণ হবে। আমরা মনে সাহস পাবো।

ধন্যবাদ
শিশির শুভ্র

সকালবেলায় দুধ দিতে এসে রামরিখ বলল, এ-রাজ্যিতে আর থাকা যাবে না। কাল রাতে গয়েশবাবু খুন হয়েছে। লাশটা নদীতে ভাসছে। মুণ্ডুটা ঝুলছে সতুবাবুদের পোড়োবাড়ির পিছনে একটা শিমুলগাছে। সেই গাছটা থেকেই রোজ গহিন রাতে দুটো সাদা ভূত নেমে এসে আমার ছেলে রামকিশোরকে ভয় দেখায়। সেই দুটো ভূতই রোজ আমার দুটো গরু আর একটা মোষের দুধ আধাআধি দুয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। রোজ আজকাল তাই দুধ কম হচ্ছে। গাহেক ঠিক রাখতে তাই কিছু কিছু জল মিশাতে হয় দুধে। দোষ ধরবেন না। তা ছিল দুটো ভূত। গয়েশবাবুকে নিয়ে হবে তিনটে। কাল থেকে দুধ আরও কমে যাবে। আরও জল মিশাতে হবে। তার চেয়ে আমি ভাবছি, গরু-মোষ বেচে দিয়ে দেশে চলে যাব।

রামরিখের কথাটা খুব মিথ্যেও নয়। আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। সান্টুর মা কুমুদিনী দেবী দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে দেখলেন, দুধে আজ জলটা কিছু বেশিই। গয়েশবাবুর ভূত এখনও দুধ খেতে শুরু করেনি বোধহয়। কিন্তু রামরিখ আগাম সাবধান হচ্ছে।

দুধ জ্বালে বসিয়ে কুমুদিনী দেবী বাড়ির সবাইকে ঠেলে তুললেন। 'ওরে ওঠ তোরা, তুমিও ওঠো গো! কী সব্বোনেশে কাণ্ড শোনো। গায়েশবাবু নাকি খুন হয়েছেন।'

বাড়িতে হুলুস্থূল পড়ে গেল। সান্টুর বাবা সুমন্তবাবু খুন শুনে বিছানা থেকে নামার সময় মশারিটা তুলতে ভুলে গেছেন। মশারিসুদ্ধ যখন নামলেন তখন তাঁর জালে-পড়া বোয়ালমাছের মতো অবস্থা। মশারি জড়িয়ে কুমড়ো-গড়াগড়ি খাচ্ছেন মেঝেয়।

সান্টুর দিদি কমলা "ওরে মা রে" বলে ভাল করে লেপে মুখ ঢেকে চোখ বুজে রইল।

ঠাকুমা ঠাকুরঘরে জপের মালা ঘোরাচ্ছিলেন। তিনিই শুধু শান্তভাবে বললেন, গণেশ চুন খেয়েছে, এটা আর এমন কী একটা খবর; সাতসকলে চোঁচামেচি করে বউমা আমার জপাটাই নষ্ট করলে।

সান্টু বাবা আর মায়ের মাঝখানে শোয়। ঘুম ভেঙে সে দেখল, বাবা পুরো মশারিটা টেনে নিয়ে মেঝোয় পড়ে কাতরাচ্ছে। দৃশ্যটা তার খুব খারাপ লাগল না। খবরটাও নয়। আজ সকালে বাবা তার জ্যামিতির পরীক্ষা নেবেন বলে কথা আছে। গোলমালে যদি সেটা হরিবোল হয়ে যায়।

বাইরের দিকের ঘরে সান্টুর জ্যাঠতুতো দাদা মঙ্গল ঘুমোয়। সে কলেজে পড়ে, ব্যায়াম করে, আর দেশের কাজ করতে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে বলে বাড়ির সবাইকে মাঝে-মাঝে শাসায়। সে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "বড়কাকা, যদি ভাল চাও তো এ-শহর ছেড়ে কলকাতায় চলো। এখানে একে-একে সবাই খুন হবে। তুমি আমি সবাই। গয়েশবাবু তিন নম্বর ভিকটিম।

মশারির জাল থেকে বেরিয়ে সুমন্তবাবু গোটাকয় বুকডন আর বৈঠক দিয়ে নিলেন। এক কালে ব্যায়াম করতেন। বহুকাল ছেড়ে দিয়েছেন। খুন শুনে হঠাৎ ঠিক করলেন, শরীরটাকে মজবুত রাখা চাই। সান্টুকেও তুলে দিলেন, ওঠ, ওঠ। ব্যায়ামে শরীর শক্তিশালী হয়, শয়তান-বদমাশদের টিট রাখা যায়। ওঠ, ব্যায়াম কর।

জ্যামিতির বদলে ব্যায়াম সান্টুর তেমন খারাপ বলে মনে হল না। সে উঠে পড়ল।

বাড়িতে খবরটা দিয়ে কুমুদিনী বেরোলেন পাড়ায় খবরটা প্রচার করতে। দারুণ খবর। সকলেই অবাক হয়ে যাবে।

পাশের বাড়ির আগড় ঠেলে ঢুকতেই দেখেন মুখুজ্যে-বাড়ির বুড়ি ঠাকুমা রোদে বসে নাতির কাঁথা সেলাই করতে করতে বকবক করছেন আপনমনে।

কুমুদিনী ডাকলেন, ও ঠাকুমা, খবর শুনেছেন।

ঠাকুমা মুখ তুলে একগাল হেসে বলেন, গয়েশের খবর তো! সে-খবর বাছা সেই কাকভোরেই ঘুটেকুড়ুনি মেয়েটা এসে বলে গেছে। কী কাণ্ড! গয়েশের মুণ্ডুটা নাকি--

হ্যাঁ, সতুবাবুদের পোড়োবাড়ির শিমুলগাছে।

আর ধড়টা-

নদীতে ভাসছে।

মুখুজ্যে-ঠাকুমা বিরক্ত হয়ে বলেন, আঃ, আজকালকার মেয়ে তোমরা বড্ড কথার পিঠে কথা বলো। বুড়ো মানুষের একটা সম্মান নেই? কথাটা শেষ করতে দেবে তো।

কুমুদিনী দেবীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। খবরটা তাহলে সবাই পেয়ে গেছে!

বাড়িতে ফিরে এসে কুমুদিনী দেখেন, দুধ পুড়ে ঝামা। সুমন্তবাবু আর সান্টু বুকডন আর বৈঠকির পর এখন মশারির দাড়ি খুলে নিয়ে স্কিপিং করছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করছে মঙ্গল। কমলা লেপ মুড়ি দিয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। রেগে গিয়ে ভারী চেঁচামেচি করতে লাগলেন কুমুদিনী দেবী। "একটা মিনিট চোখের আড়ালে গেছি কি দুধ পুড়ে ঝামা হয়ে গেল! বলি এতগুলো লোক বাড়িতে, কারও কি চোখ নেই, নাকি নাকে পোড়া গন্ধটাও যায় না কারও।"

এই সময়ে ঝি পদ্ম কাজ করতে আসায় কুমুদিনী থেমে গেলেন। পদ্ম চোখ কপালে তুলে বলল, ও বউদি, শুনেছ?

কুমুদিনী একগাল হেসে বললেন, শুনিনি আবার! গয়েশবাবুর মুণ্ডুটা-

হাঁ গো, সতুবাবুদের শিমুল গাছে ঝুলছে।

আর ধড়টা-

হাঁ গো, নদীতে ভাসছে।

কুমুদিনী বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমাদের জ্বালায় বাপু কথাটা শেষ করার উপায় নেই। 'ক' বলতেই কেষ্ট বোঝে। নাও তো, মেলা বেলা হয়েছে, কাজে হাত দাও।

সুমন্তবাবু সান্টু আর মঙ্গলকে নিয়ে সরেজমিনে ঘটনাটা দেখতে বেরোলেন। রাস্তায় বেরিয়েই বললেন, হাঁটবে না। দৌড়োও। দৌড়োলে একসারসাইজ হয়, তাড়াতাড়ি পৌঁছনোও যায়। কুইক! রান!

তিনজন দৌড়োতে থাকে। মাঝে-মাঝে থেমে সুমন্তবাবু দুহাত চোঙার মতো মুখের কাছে ধরে টারজানের কায়দায় হাক মারেন, "গয়েশীবাবু খু-উ-ন!" খবরটা প্রচারও তো করা চাই।

সকালবেলাতেই কবি সদানন্দ মহলানবিশ এসে হাজির। বগলে কবিতার খাতা। ডান হাতে মজবুত একটা ছাতা। বাঁ হাতে বাজারের ব্যাগ।

কবি সদানন্দকে দেখলে সকলেই একটু তটস্থ হয়ে পড়ে। মুশকিল হল, সদানন্দর কবিতা কেউ ছাপতে চায় না। কিন্তু না ছাপলেও কবিতা যাকে একবার ধরেছে তার পক্ষে কি আর কবিতা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব? সদানন্দও তাই কবিতা লেখা ছাড়েনি। একটু বুঝদার লোক বলে যাকে মনে হয় তাকেই ধরে কবিতা শুনিয়ে দেয়। ফুচুর জ্যাঠামশাই বলেন, সদাটার আর সব ভাল, কেবল কবিতা শোনানোর বাতিকটা ছাড়া।

সকালে কাছারি-ঘরে বসে ফুচুর জ্যাঠামশাই পাটের গুছি পাকিয়ে গরুর দড়ি তৈরি করছিলেন। সদানন্দকে দেখে একটু আঁতকে উঠে বললেন, ওই যাঃ, একদম ভুলেই গেছি, আজ সকালে আমার একবার সদাশিব কবরেজের বাড়ি যেতে হবে। গোপালাখুড়োর এখন-তখন অবস্থা। নাঃ, এক্ষুনি যেতে হচ্ছে।

সদানন্দ কবি হলেও কবির মতো দেখতে নয়। রীতিমত ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। শোনা যায় কুস্তি আর পালোয়ানিতে একসময়ে খুব নাম ছিল। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গায়ে মোটা কাপড়ের একটা হাফ-হাতা শার্ট, পরনে ধুতি। চোখের দৃষ্টি খুব আনমনা। আজ তাকে আরও আনমনা দেখাচ্ছে। মুখটা একটু বেশি শুকনো। চোখে একটা আতঙ্কের ভাব। ফুচুর জ্যাঠামশাইয়ের দিকে চেয়ে সদানন্দ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, ব্যস্ত হবেন না। গোপালাখুড়ো আজ একটু ভাল আছে। সদাশিব কবিরাজ গেছে ভিনগাঁয়ে রুগি দেখতে। আর-আর আমি আজ। আপনাকে কবিতা শোনাতে আসিনি।

ফুচুর জ্যাঠামশাই গঙ্গাগোবিন্দ একটা আরামের শ্বাস ফেলে বলেন, তাই নাকি? তা-তাহলে বরং--

হ্যাঁ, একটু বসি। আপনি নিশ্চিন্তে দড়ি পাকাতে থাকুন। আমি এসেছি, একটা সমস্যায় পড়ে।

কী সমস্যা বলো তো!

আপনি তো সায়েন্সের ছাত্র শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ। বঙ্গবাসীতে বি এসসি পড়তাম। স্বদেশি করতে গিয়ে আর পরীক্ষাটা দিইনি। তবে আই এসসি-তে রেজাল্ট ভাল ছিল। ফাস্ট ডিভিশন, উইথ দুটো লেটার।

বাঃ। তাহলে আপনাকে দিয়ে হবে। আচ্ছা, আলোকবর্ষ কথাটার মানে কী বলুন তো।

'ও, ওটা হল গিয়ে ইয়ে' বলে ফুচুর জ্যাঠামশাই একটু ভাবেন। তারপর বলেন, আমাদের আমলে সায়েন্সে রবিঠাকুর পাঠ্য ছিল না।

কবি সদানন্দ বিরক্ত হয়ে বলে, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসছে কোত্থেকে? আলোকবর্ষ কথাটার মানে জানতে চাইছি।

ডিকশনারিটা দেখলে হয়। তবে মনে হচ্ছে যে-বছরটায় বেশ আলো-টালো হয় আর কি, আই মিন গুড ইয়ার।

সদানন্দ বিরস মুখে বলে, এ-শহরে কলকাতা থেকে একটি অতি ফাজিল ছেলের আমদানি হয়েছে। আমাদের পরেশের ভাগ্নে। কাল নতুন একটা কবিতা লিখলাম।

পরেশকে শোনাতে গেছি সন্ধেবেলা। একটা লাইন ছিল, 'শত আলোকবর্ষ পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল হে বিধাতা...'। ছোকরা সঙ্গে-সঙ্গে হাঃ হাঃ করে হেসে বলে উঠল, আলোকবর্ষ কোনও বছর-টছর নয় মশাই, ওটা হল গিয়ে দূরত্ব।'

জ্যাঠামশাই দড়ি পাকানো বন্ধ রেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, বলেছে?

বলেছে। অনেকক্ষণ ছোকরার সঙ্গে তর্ক হল। রাত্তিরে গেলুম হাইস্কুলের চণ্ডীবাবুর কাছে। সায়েন্সের টীচার। খবর-টবর রাখেন। তা তিনিও মিন-মিন করে যা বললেন তার অর্থ, ছোকরা নাকি খুব ভুল বলেনি। আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল...

'আমাদের আমলে বিরাশি ছিল। এখন তাহলে বেড়েছে।' ফুচুর জ্যাঠামশাই গভীর হয়ে বলেন।

তা বাড়াতেই পারে। চাল-ডালের দাম বাড়ছে, মানুষের নির্বুদ্ধিতা বাড়ছে, আলোর গতি বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সেই গতিতে ছুটে এক বছরে আলো যতটা দূরে যায় ততটা দূরত্বকেই নাকি বলে আলোকবর্ষ।

বাব্বাঃ! পাল্লাটা তাহলে কতটা দাঁড়াচ্ছে?

সাতানব্বই হাজার সাতশ একষট্টি কোটি ষাট লক্ষ মাইল।

ফুচুর জ্যাঠামশাই একটু ভাবিত হয়ে বলেন, উহুঁ উই! অত হবে না। আমাদের আমলে আরও কিছু কম ছিল যেন। ষাট নয়, বোধ হয় চুয়ান্ন লক্ষ মাইল।

সদানন্দ খোঁকিয়ে উঠে বলে, ছ লক্ষ মাইল না হয় ছেড়েই দিলাম মশাই, কিন্তু প্রশ্নটা তো তা নয়। কবিতাটার কী হবে?

ওটা তো ভালই হয়েছে। আলোর দৌড়ের সঙ্গে কবিতার কী সম্পর্ক?

কথাটা কি তাহলে ভুল? শত আলোকবর্ষ পরে কি দেখা হওয়াটা অসম্ভব? আলোকবর্ষ যদি টাইম ফ্যাকটরই না হয়, তাহলে তো খুবই মুশকিল।

ফুচুর জ্যাঠামশাই একটু ভেবে বলে ওঠেন, এক কাজ করো। ওটা বরং 'শত আলোকবর্ষ ঘুরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল হে বিধাতা..? এরকম করে দাও। ল্যাঠা চুকে যাবে, কেউ আর ভুল ধরতে পারবে না। সায়েন্সও মরল, কবিতাও ভাঙল না।

হঠাৎ সদানন্দর মুখ উজ্জ্বল হল। বলল, এই না হলে সায়েন্সের মাথা! বাঃ, দিব্যি মিলে গেছে। শত আলোকবর্ষ ঘুরে...বাঃ!

ঠিক এই সময়ে নাপিতভায়া নেপাল ফুচুর জ্যাঠামশাইয়ের দাড়ি চাঁচতে এল। মুখ গভীর। জল দিয়ে গালে সাবান মাখাতে-মাখাতে খুব ভারী গলায় বলল, ঘটনা শুনেছেন? ওঃ কী রক্ত! কী রক্ত! গয়েশবাবু! বুঝলেন! আমাদের তেলিপাড়ার গয়েশবাবু-

ঠিক এই সময়ে পাশের রাস্তা দিয়ে তিনটে ছোট-বড় মূর্তি দৌড়ে এল। গোপাল ক্ষুর হাতে একটু আঁতকে উঠেছিল। মূর্তি তিনটে থেমে গেল। একজন মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'গয়েশবাবু খু-উ-ন! গয়েশবাবু খু-উ-ন?' তারপর আবার দৌড়ে চলে গেল।

'গয়েশ খুন হয়েছে? অ্যাঁ?' ফুচুর জ্যাঠামশাই গঙ্গাগোবিন্দ হাঁ করে রইলেন। গয়েশ তাঁর দাবার পার্টনার ছিল যে!

নেপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে নাহয় হল। কিন্তু সুমন্তবাবুর আক্কেলটা দেখলেন। একটা গুহ্য খবর আস্তে আস্তে ভাঙছি, উনি হেঁড়ে গলায় চেচিয়ে পাড়া মাথায় করে চলে গেলেন।

কিন্তু মুশকিল হল, গয়েশবাবুর লাশটা নদী থেকে তোলার পর দেখা গেল, সেটা মোটেই গায়েশবাবু বা আর কারও লাশ নয়। সেটা একটা গোড়াকাটা কলাগাছ। আর সতুবাবুদের গা-ছমছমে পোড়োবাড়িটার পিছনের জঙ্গলে-ছাওয়া বাগানে শিমুলগাছের ডালে যেটা ছিল, সেটাও গয়েশবাবুর মুণ্ডু নয়। ভাল গাছ বাইতে পারে বলে ফুচুকেই সবাই ঠেলে তুলেছিল গাছে। সে অনেক আগাছা, লতানে গাছ আর শিমুলের পাতার আড়াল ভেদ করে মগড়ালের কাছাকাছি পৌছতেই গোটাকয় মৌমাছি তেড়ে এসে হুল দিল। ফুচু বড়-বড় চোখে চেয়ে দেখল, ডাল থেকে গয়েশবাবুর মুণ্ডু তার দিকে চেয়ে দাঁত খিচোচ্ছে না, বরং লম্বা দাড়িওলা শান্ত একটা মুখের মতো ঝুলে আছে একটা মৌচাক।

তাহলে গয়েশবাবুর হল কী?

লোকে গয়েশবাবুকে জানে অতি শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট মানুষ বলে। তিনি শাস্ত লোক ছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর ব্যবহারও ছিল অতি শিষ্ট। কিন্তু তাঁর লেজ নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকেই বলে, 'গয়েশবাবুর লেজ আছে। আমার ঠাকুর্দার নিজের চোখে দেখা! সন্ধেবেলা ঘরের দাওয়ায় নিরিবিলিতে বসে তিনি লেজ দিয়ে মশা তাড়ন।' আবার অনেকের ধারণা-লেজের কথাটা স্রেফ গাঁজা, ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন বলে মাস্টারমশাইরা তাঁর লেজ কল্পনা করেছিলেন, সেই থেকে কথাটা চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু এখন গয়েশবাবুও নেই, তাঁর লেজও দেখা যাচ্ছে না।

বানর থেকে মানুষের যে বিবর্তন, সেই ধারায় একটা শূন্যস্থান আছে। নৃতত্ত্ববিদরা সেই শূন্যস্থানের নাম দিয়েছেন মিসিং লিংক। কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক মৃদঙ্গবাকুর খুব আশা ছিল, গয়েশবাবুকে দিয়ে সেই মিসিং লিংক সমস্যার সমাধান হবে। হয়তো বা লেজবিশিষ্ট মানুষের প্রথম সন্ধান দিয়ে তিনিই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবেন।

মৃদঙ্গবাবু প্রথমে খুনের খবরটা পেয়ে হায় হায় করে বুক চাপড়াতে লাগলেন। এমন কি এই শীতে গিয়েশবাবুর লাশ তুলতে তিনিই প্রথম নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঝাঁপিয়ে পড়ার পর তাঁর খেয়াল হল, ওই যাঃ তিনি যে সাঁতার জানেন না! যখন বিস্তর জল ও নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর তাঁকে তোলা হল তখনও গয়েশবাবুর জন্য তিনি শোক করছিলেন। পরের জন্য মৃদঙ্গবাবুর এমন প্রাণ কাঁদে দেখে সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করছিল। আজ; যাই হোক, ধড় বা মুণ্ডু কোনওটাই গয়েশবাবুর নয় জেনে মৃদঙ্গবাবু বাড়ি ফিরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছেন।

সমস্যাটা মৃদঙ্গবাবুকে নিয়ে নয়, গয়েশবাবুকে নিয়ে। এই শান্তশিষ্ট এবং বিতর্কিত-লেজবিশিষ্ট মানুষটির নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই। পশ্চিম ভারতের কোথাও তিনি চাকরি করতেন। মেলা টাকা করেছেন। অবশেষে একটু বয়স হওয়ার পর দেশের জন্য প্রাণ কাঁদতে থাকায় চলে এসে পৈতৃক আমলের বাড়িটায় একাই থাকতে লাগলেন। খুব বাগানের শখ ছিল। জ্যোতিষবিদ্যে জানা ছিল। ভাল দাবা খেলতে পারতেন। ছোটখাটো

ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তবে মাঝে-মাঝে কোনও লোককে দেখে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে ফেলতেন। কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও কথাগুলির গূঢ় অর্থ আছে বলে অনেকের মনে বিশ্বাস আছে।

এলাকার বিখ্যাত ঢোলক-বীর হল গোবিন্দ। তার ভাই জয়কৃষ্ণ ভাল ঢাক বাজায়; ফলে গোবিন্দর নাম হয়ে গেছে ঢোলগোবিন্দ আর জয়কৃষ্ণকে আদর করে ডাকা হয় জয়ঢাক বলে। সেবার ঈশানী কালীবাড়িতে বিরাট করে কালীপুজো হচ্ছে; কালীর গায়ে খাঁটি সোনার একশো আট ভরি গয়না। সকালবেলা দেখা গেল একটা মটরদানা হার আর একজোড়া রতনচুড় নেই। হৈ-চৈ পড়ে গেল চারধারে। দারোগা-পুলিশে ছয়লাপ। মণ্ডপের সকলকে ধরে সার্চ করা হল। পাওয়া গেল না। লোকজন কিছু সরে গেলে গয়েশবাবু ঢোলগোবিন্দের কাছে গিয়ে ভারী নিরীহ গলায় বললেন, 'ঢোলের মধ্যেই গোল হে।' তারপর জয়ঢাকের কাছে গিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'ঢাকেই যত ঢাকাগুরগুর।' এ-কথায় দুই ভাই খুব গভীর আর মনমরা হয়ে গেল হঠাৎ। ঘণ্টা দুই বাদে ঈশানীকালীর সিংহাসনের পিছনে খোয়া-যাওয়া গয়না ফিরে এল। সকলেই বুঝল, গয়েশবাবুর কথা এমনিতে অর্থহীন মনে হলেও যার বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে আর ভয় খেয়ে গয়নাও ফেরত দিয়েছে।

একদিন বাজারের রাস্তায় গয়েশবাবু কবি সদানন্দকে বলেছিলেন, কাজটা ভাল করেননি।

কোন কাজটা?

কাজটা ঠিক হয়নি। সদানন্দবাবু। এর বেশি আমি আর ভেঙে বলতে পারব না।

গয়েশবাবুর এ-কথায় সদানন্দ মহা মুশকিলে পড়ে আধবেলা ধরে আকাশ-পাতাল ভাবলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, আগের রাতে যে কবিতাটা লিখেছেন, তাতে এক জায়গায় আশীবিষের সঙ্গে কিসমিস মিল দিয়েছেন। মিলটা দেওয়ার সময় মনটায় খটকা লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু তখন ওটা গোঁজামিল বলে ধরতে পারেননি। গয়েশবাবুর ইংগিতে ধরতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিসমিস কেটে সে-জায়গায় অহর্নিশ বসিয়ে কবিতার খাতা বগলে নিয়ে ছুটলেন গয়েশবাবুর বাসায়।

মৃদঙ্গবাবুকেও একবার জব্দ করেছিলেন গয়েশবাবু। হয়েছে কী, গয়েশবাবুর লেজের কথা কানাঘুষোয় শুনে মৃদঙ্গবাবু প্রায়ই রাস্তাঘাটে তাঁর পিছু নিতেন। অবশ্য খুবই সন্তর্পণে এবং গোপনে; যদি হঠাৎ কখনও লেজটার কোনও আভাস-ইংগিত পাওয়া যায়। একদিন হরিহরবাবুর চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় দুজনে একসঙ্গেই যাচ্ছিলেন। অভ্যাসবশে মৃদঙ্গবাবু মাঝে-মাঝে গয়েশবাবুর লেজ খুঁজতে আড়চোখে চাইছেন। এমন সময় গয়েশবাবু হঠাৎ থমকে গিয়ে চাপা স্বরে বললেন, মৃদঙ্গবাবু! আছে! আছে!

আছে? বলে মৃদঙ্গবাবু স্থানকালপত্র ভুলে "হুররে" বলে লাফিয়ে উঠলেন।

গয়েশবাবু তখন চাপা স্বরে বললেন, কাউকে বলবেন না কথাটা।

মৃদঙ্গবাবু আহ্বাদের গলায় বললেন, আরে না, না। তবে একবারটি যদি চোখের দেখা দেখিয়ে দেন। তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন নয়।

গয়েশবাবু আঁতকে উঠে বললেন, দেখাব? না, না, তাহলে সবাই টের পেয়ে যাবে। দেখানোর দরকার নেই। শুধু জেনে রাখুন, লোকটা এখানেই আছে।

লোকটা? লোকটা না লেজটা? ঠিক করে বলুন তো আর একবার গয়েশদা। ছেলেবেলায় একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। সেই থেকে বাঁকানো একটু কম শুনি।

'লেজ!' গয়েশবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেন, 'লেজ কোথায়? লেজের কথা বলিনি। সেই লোকটার কথা বলছি। সে-ই যে লোকটা।'

কিন্তু তখন মৃদঙ্গবাবুর কৌতুহল নিভে গেছে। কোনও লোক নিয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। লোকেরা সব বেয়াদব, বেয়াড়া, বিচ্ছিরি। তবে হ্যাঁ, লেজওয়ালা কোনও লোক পেলে তাকে তিনি মাথায় করে রাখতে রাজী। মৃদঙ্গবাবু তাই নিস্তেজ গলায় বললেন, কোন লোকটা?

গয়েশবাবু মিটমিট করে একটু হাসছিলেন। বললেন, সে-কথা পরে। কিন্তু আগে বলুন তো, লেজের কথাটা আপনার মাথায় এল কেন? কিসের লেজ?

মৃদঙ্গবাবু লজ্জা পেয়ে আমতা-আমতা করতে লাগলেন, খোলাখুলি কথাটা বলাও যায় না। গয়েশবাবু চটে যেতে পারেন। তাই তিনি ভণিতা করতে লাগলেন, আসলে কী জানেন গয়েশদা, কিছুদিন যাবৎ আমি লেজের উপকারিতা নিয়ে ভাবছি। ভেবে দেখলাম, লেজের মতো জিনিস হয় না। বেশির ভাগ জীবজন্তুরই লেজ আছে, শুধু মানুষের লেজ না থাকাটা ভারী অন্যায়। লেজ দিয়ে মশা মাছি তাড়ানো যায়, নিজের পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া যায়, লেজে খেলানো যায়, লেজ গুটিয়ে পালানো যায়। ভেবে দেখুন, আজ মেয়েদের কত একসট্রা গয়না পরার স্কোপ থাকত লেজ হলে।

গয়েশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, খুব খাঁটি কথা। তা আমি যে-লোকটার কথা বলছি, কী বলব আপনাকে, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই লোকটারও লেজ আছে। শুধু আছে নয়, সে রীতিমত আমাকে লেজে খেলাচ্ছে বেশ-কিছুদিন ধরে।

মৃদঙ্গবাবু 'অ্যাঁ?' বলে চোখ বিস্ফারিত করেন। 'বলেন কী দাদা, তাহলে কি উলটো বিবর্তন ঘটতে শুরু করল নাকি? জনে-জনে লেজ দেখা দিলে তো-'

এরপর গয়েশবাবু আর কথা বাড়াতে চাননি। মৃদঙ্গবাবুর বিস্তর চাপাচাপিতেও না।

কিন্তু মৃদঙ্গবাবু খুব ভাবিত হয়ে পড়লেন। শুধু এই ছোট গঞ্জ-শহরেই যদি দু'দুটো লেজওয়ালা লোকের আবিভব ঘটে থাকে, তবে পৃথিবীতে না জানি আরও কত লক্ষ লোকের লেজ দেখা দিয়েছে এতদিনে। বিবর্তনের চাকা উলটো দিকে ঘোরে না। বড়-একটা। তবে ইংরেজিতে একটা কথা আছে, হিস্টরি রিপিটস ইটসেলফ। সুতরাং কিছুই বলা যায় না। তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

লেজের কথা আর কিছু জানা যায় না।

তবে গয়েশবাবু একদিন সন্ধেবেলায় দাবা খেলার সময় ফুচুর জ্যাঠামশাই গঙ্গাগোবিন্দকে বলেছিলেন, রুইতনটা দেখলেই বোঝা যায়।

গঙ্গাগোবিন্দ গয়েশবাবুর একটা বিপজ্জনক আগুয়ান বোড়েকে গজ দিয়ে চেপে দিতে যাচ্ছিলেন। থেমে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, রুই? তা কত করে নিল?

রুই নয়। রুইতন।

গঙ্গাগোবিন্দ শশব্যস্ত দাবার ছকের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, রুইতন? বলো কী? এতক্ষণ তবে কি আমরা বসে-বসে তাস খেলছি? দাবা নয়? এঃ, সেটা এতক্ষণ বলোনি কেন?

গয়েশবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, না, আমরা দাবাই খেলছি। কিন্তু রুইতনের কথাটা ভুলতে পারছি না।

গঙ্গাগোবিন্দ দাবা খেলতে বসলে এতই মজে যান যে, দুনিয়ার কিছুই আর মনে থাকে না। খেলার পরেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। আর যতক্ষণ তা ফিরে না আসে, ততক্ষণ তিনি লোকের কথাবার্তার অর্থ বুঝতে পারেন না, জল আর দুধের তফাত ধরতে পারেন না, তারিখ মাস বা দিন পর্যন্ত মনে পড়ে না তাঁর। তাই তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, ভুলতে পারছ না! কী মুশকিল।

গয়েশবাবু মোলায়েম স্বরে বললেন, রুইতন বটে, তবে তাসের রুইতন নয়। একটা লোকের বা হাতের তেলোয় মস্ত একটা রুইতন আছে। দেখলেই চিনবেন। পাঞ্জাব থেকে পিছু নিয়েছিল। মোগলসরাইতে চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু গন্ধ শুকে-শুঁকে ঠিক খুঁজে বের করেছে আমাকে।

গঙ্গাগোবিন্দ চোখ বুজে বললেন, আর একবার বলো বুঝতে পারিনি।

গয়েশবাবু আবার বললেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চোখ খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজকাল চারদিকে ভাল-ভাল লোকগুলোর কেন যে মাথা বিগড়ে যাচ্ছে।

গয়েশবাবু আর একটাও কথা বললেন না। শুধু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এখন গয়েশবাবু গায়েব হওয়ার পর সেইসব কথা সকলের মনে পড়তে লাগল।

পরদিন দারোগা বজ্রাঙ্গ বোস তদন্তে এলেন। খুবই দাপুটে লোক। লম্বা-চওড়া চেহারা; প্রকাণ্ড মিলিটারি গোঁফ। ভূত আর আরশোলা ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকেই ভয় পান না। তিনি এ-অঞ্চলে বদলি হয়ে আসার আগে এখানে চোর আর ডাকাতদের ভীষণ উৎপাত ছিল। কেলো, বিশে আর হরি ডাকাতের দাপটে তল্লাট কাঁপত। গুণধর, সিধু আর পটল ছিল বিখ্যাত চোর। এখন সেই কেলো আর বিশে বজ্রাঙ্গ বোসের হাত-পা টিপে দেয় দুবেলা। হরি দারোগীবাবুর স্নানের সময় গায়ে তেল মালিশ করে। গুণধার কুয়ো থেকে জল তোলে, সিধু দারোগাবাবুর জুতো বুরুশ করে আর পটলা বাগানের মাটি কুপিয়ে দেয়।

বজ্রাঙ্গ বোস গয়েশবাবুর বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। বিরাট বাড়ি। সামনে এবং পিছনে মস্ত বাগান। তবে সে-বাগানের যত্ন নেই বলে আগাছায় ভরে আছে। নীচে আর ওপরে মিলিয়ে দোতলা বাড়িটাতে খান আষ্টেক ঘর। তার বেশির ভাগই বন্ধ। নীচের তলায় শুধু সামনের বৈঠকখানা আর তার পাশের শোবার ঘরটা ব্যবহার করতেন গয়েশবাবু। বৈঠকখানায় পুরনো আমলের সোফা, কোঁচ, বইয়ের আলমারি, একটা নিচু তক্তপোশের ওপর ফরাস পাতা, তার ওপর কয়েকটা তাকিয়া। শোবার ঘরে মস্ত একটা বাহারি খাট, দেওয়াল আলমারি, জানালার ধারে লেখাপড়ার জন্য টেবিল চেয়ার। জল

রাখার জন্য একটা টুল রয়েছে বিছানার পাশে। খাটের নীচে গোটা দুই তোরঙ্গ। সবই হাঁটকে-মাটকে দেখলেন বজ্রাঙ্গ। তেমন সন্দেহজনক কিছু পেলেন না।

গয়েশবাবুর রান্না ও কাজের লোক ব্রজকিশোর হাউমাউ করে কেঁদে বজ্রাঙ্গর মোটা-মোটা দুখানা পা জড়িয়ে ধরে বলে, বড়বাবু, আমি কিছু জানি না।

বজ্রাঙ্গ বজ্রাদপি কঠোর স্বরে বললেন, কী হয়েছিল ঠিক ঠিক বল।

ব্রজকিশোর কাঁধের গামছায় চোখ মুছে বলল, আজ্ঞে, বাবু রাতের খাওয়ার পর একটু পায়চারি করতে বেরোতেন। হাতে টর্চ আর লাঠি থাকত। সেদিনও রাত দশটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন। বাবু ফিরলে তবে আমি রোজ শুতে যাই। সেদিনও বাবুর জন্য বসে ছিলাম। সামনের বারান্দায় বসে ঢুলছি আর মশা তাড়াচ্ছি। করতে-করতে রাত হয়ে গেল। বড় ঘড়িতে এগারোটা বাজল। তারপর বারোটা। আমি ঢুলতে ঢুলতে কখন গামছাখানা পেতে শুয়ে পড়েছি আজ্ঞে। মাঝরাতে কে যেন কানে—কানে ফিসফিস করে বলল, 'এখনও ঘুমোচ্ছিস আহাম্মক? গয়েশবাবুকে যে কেটে দুখানা করে ধড়টা নদীর জলে ভাসিয়ে দিল আর মুণ্ডুটা ঝুলিয়ে দিল গাছে।' সে-কথা শুনে আমি আঁতকে জেগে উঠে দেখি সদর দরজা খোলা। বাবু তখনও ফেরেনি। তখন ভয় খেয়ে আশপাশের লোকজন ডেকে দু'চারজনকে জুটিয়ে বাবুকে খুঁজতে বেরোই। ভোররাতের আলোয় ভাল ঠাহর পাইনি বড়বাবু, তাই নদীর জলে যা ভাসছিল, সেটাকেই বাবুর ধড় আর গাছের ডালে যেটা ঝুলছিল সেটাকেই বাবুর মুণ্ডু বলে ঠাহর হয়েছিল আমাদের। কিন্তু বাবুর যে সত্যি কী হয়েছে তা জানি না। '

বজ্রাঙ্গ ধমক দিয়ে বলেন, টর্চ আর লাঠির কী হ'ল?

ব্রজকিশোর জিব কেটে নিজের কান ছুঁয়ে বলল, একেবারে মনে ছিল না আজ্ঞে। হ্যাঁ, সে দুটো আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি, টর্চটা নদীর ধারে পড়ে ছিল, লাঠিটা সেই অলক্ষুণে শিমুলগাছের তলায়।

আর লোকটা নিরুদ্দেশ?

আজ্ঞে।

কথাবার্তা হচ্ছে সামনের বারান্দায়। বজ্রাঙ্গ চেয়ারের ওপর বসা, পায়ের কাছে ব্রজকিশোর। পুলিশ এসেছে শুনে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে সামনে। রামরিখ, সুমন্তবাবু, সান্টু, মঙ্গল, মৃদঙ্গবাবু, নেপাল, কে নয়? বজ্রাঙ্গ তাদের দিকে চেয়ে একটা বিকট হাঁক দিয়ে বললেন, তাহলে গেল কোথায় লোকটা?

বজ্রাঙ্গের হাঁক শুনে ভিড়টা তিন পা হটে গেল। বজ্রাঙ্গ কটমট করে লোকগুলোর দিকে চেয়ে বললেন, নিরুদ্দেশ হলেই হল? দেশে আইন নেই? সরকার নেই? যে যার খুশিমতো খবরবার্তা না দিয়ে বেমালুম গায়েব হয়ে গেলেই হল? এই আপনাদের বলে দিচ্ছি, এরপর থানায় ইনফরমেশন না দিয়ে কারও নিরুদ্দেশ হওয়া চলবে না। বুঝেছেন?

বেশির ভাগ লোকই ঘাড় নেড়ে কথাটায় সম্মতি জানাল। শুধু পরেশের ভাগ্নে কলকাতার সেই ফাজিল ছোকরা পল্টু বলে উঠল, বজ্রাঙ্গবাবু, খুন হলেও কি আগে ইনফরমেশন দিয়ে নিতে হবে?

বজ্রাঙ্গবাবুর কথার জবাবে কথা কয় এমন সাহসী লোক খুব কমই আছে। ছোকরার এলেম দেখে বজ্রাঙ্গবাবু খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। পরেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বলে, আমার ভাগ্নে এটি! সদ্য কলকাতা থেকে এসেছে, আপনাকে এখনও চেনে না কিনা।

এ-কথায় বজ্রাঙ্গবাবুর বিস্ময় একটু কমল। বললেন, তাই বলে। কলকাতার ছেলে। তা ওহে ছোকরা, খুনের কথাটা উঠল কিসে? কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ খুন-খুন করে গলা শুকোচ্ছ কেন?

পল্টু ভালমানুষের মতো বলল, খুনের কথা ভাবলেই আমার গলা শুকিয়ে যায় যে! তার ওপর অপঘাতে মরলে লোকে মরার পর ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেদিন রাত্রে-থাক, বলব না।

বজ্রাঙ্গবাবু কঠোরতার চোখে পল্টুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কেউ যদি সেদিন রাত্রে-বলে একটা গল্প ফাঁদবার পরই থাক, বলব না বলে বেঁকে বসে তাহলে কার না রাগ হয়। বজ্রাঙ্গবাবুরও হল। গাঁকি করে উঠে বললেন, বলবে না মানে? ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি?

পল্টু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, আপনারা বিশ্বাস করবেন না। বললে হয়তো হাসবেন। কিন্তু সেদিন রাত্রে-উরেব্বাস---!

বজ্রাঙ্গবাবু ধৈর্য হারিয়ে একজন সেপাইকে বললেন, ছেলেটাকে জাপটে ধরে তো! তারপর জোরসে কাতুকুতু দাও।

এতে কাজ হল। পল্টু তাড়াতাড়ি বলতে লাগল, সেদিন রাত্রে আমি গয়েশবাবুকে দেখেছি।

দেখেছে? তাহলে সেটা এতক্ষণ বলোনি কেন?

ভয়ে। আপনাকে দেখলেই ভয় লাগে। কিনা।

একথা শুনে বজ্রাঙ্গবাবু একটু খুশিই হন। তাঁকে দেখলে ভয় খায় না। এমন লোককে তিনি পছন্দ করেন না। গোঁফের ফাঁকে চিড়িক করে একটু হেসেই তিনি গভীর হয়ে বললেন, রাত তখন ক'টা?

নিশুতি রাত। তবে কটা তা বলতে পারব না। আমার ঘড়ি নেই কিনা। মামা বলেছে বি-এ পাশ করলে একটা ঘড়ি কিনে দেবে। আচ্ছা দারোগাবাবু, একটা মোটামুটি ভাল হাতঘড়ির দাম কত?

গম্ভীরতর হয়ে বজ্রাঙ্গবাবু বললেন, ঘড়ির কথা পরে হবে। আগে গয়েশবাবুর কথাটা শুনি।

ও হ্যাঁ। তখন নিশুতি রাত। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল! আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, একটা লোক নিজের কাটা মুণ্ডু হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দেখে ভয়ে--

বজ্রাঙ্গবাবুর মুখটা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভূত তিনি মোটেই সইতে পারেন না। সামলে নিয়ে বললেন, দ্যাখো ছোকরা, বেয়াদবি করবে তো তোমার মুণ্ডুটাও--

আচ্ছা, তাহলে বলব না। বলে পল্টু মুখে কুলুপ আঁটে।

বজ্রাঙ্গবাবু একটু মোলায়েম হয়ে বলেন, বলবে না কেন? বলো। তবে ওইসব স্বপ্নের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো বাদ দেওয়াই ভাল। ওগুলো তো ইররেলেভ্যান্ট।

পল্টু মাথা নেড়ে বলে, আপনার কাছে ইররেলেভ্যান্ট হলেও আমার কাছে নয়। স্বপ্নটা না দেখলে আমার ঘুম ভাঙত না। আর ঘুম না ভাঙলে গয়েশবাবুকেও আমি দেখতে পেতাম না।

আচ্ছ বলে। বজ্রাঙ্গবাবু বিরাম মুখে বলেন।

আমি শুই মামাবাড়ির ছাদে একটা চিলেকোঠায়। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমার আর ঘুম আসছিল না। কী আর করি? উঠে সেই শীতের মধ্যেই ছাদে একটু পায়চারি করছিলাম। তখন হঠাৎ শুনি, নীচের রাস্তায় কাদের ফেন ফিসফাস কথা শোনা যাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখি, গয়েশবাবু একজন লোকের সঙ্গে খুব আস্তে-আস্তে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন।

লোকটাকে লক্ষ করেছ?

করেছি। রাস্তায় তেমন ভাল আলো ছিল না। তাই অস্পষ্ট দেখলাম। তবে মনে হল লোকটা বাঁ পায়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে।

কতটা লম্বা?

তা গয়েশবাবুর মতোই হাইট হবে।

চেহারাটা দেখনি? মুখটা?

প্রথমটায় নয়; ওপর থেকে মনে হচ্ছিল, লোকটার হাইট স্বাস্থ্য সবকিছুই গয়েশীবাবুর মতো।

তাদের কথাবার্তা কিছু কানে এসেছিল?

আজ্ঞে না। তবে মনে হচ্ছিল তাঁরা দুজন খুব গুরুতর কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। গয়েশবাবুকে দেখে আমি ছাদ থেকে বেশ জোরে একটা হাঁক দিলাম, গয়েশকাকা-আ-আ...

পল্টু এত জোরে চেঁচাল যে, বজ্রাঙ্গ পর্যন্ত কনে হাত দিয়ে বলে ওঠেন, ওরে বাপ রে; কানে তালা ধরিয়ে দিলে?

পল্টু ভালমানুষের মতো মুখ করে বলে, যা ঘটেছিল তা হুবহু বর্ণনার চেষ্টা করছি।

অত হুবহু না হলেও চলবে বাপু। একটু কাটছাট করতে পারো। যাক, তুমি তো ডাকলে। তারপর গয়েশবাবু, কী করলেন?

সেইটেই তো আশ্চর্যের। গয়েশবাবুর সঙ্গে আমার খুব খাতির। উনি আমাকে নিয়ে প্রায়ই বড় ঝিলে মাছ ধরতে যান, চন্দ্রগড়ের জঙ্গলে আমি ওঁর সঙ্গে পাখি শিকার করতেও গেছি! ইদানীং দাবার তালিম নিচ্ছিলাম। যাঁর সঙ্গে এত খাতির, সেই গয়েশবাবু আমার ডাকে সাড়াই দিলেন না।

কানে কম শুনতেন নাকি?

মোটেই না। বরং খুব ভাল শুনতেন। উনি তো বলতেন, গহিন রাতে আমি পিঁপড়েদের কথাবার্তাও শুনতে পাই।

বলো কী! পিঁপড়েরা কথাবার্তা বলে নাকি?

খুব বলে। দেখেননি। দুটো পিঁপড়ে মুখোমুখি হলেই একটু থেমে একে অন্যের খবরবার্তা নেয়? পিঁপড়েরা স্বভাবে ভারী ভদ্রলোক।

আচ্ছা, পিঁপড়েদের কথা আর-একদিন শুনিয়ে দিও। এবার গয়েশবাবু...?

হ্যাঁ। গয়েশবাবু তো আমার ডাকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আমার কেমন মনে হল, আমি ভাল করে গয়েশবাবুর হাঁটাটা লক্ষ করলাম। আমার মনে হল, উনি খুব স্বাভাবিকভাবে হাঁটছেন না, কেমন যেন ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছেন।

ভেসে-ভেসে?

ভেসে-ভেসে। যেন মাটিতে পা পড়ছে না। শুনেছি। অনেক সময় লোকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটে। সে হাঁটা কেমন তা আমি দেখিনি। কিন্তু গয়েশবাবুকে দেখে মনে হল, উনি বোধহয় ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই হাঁটছেন, তাই আমার ডাক শুনতে পাননি। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

পড়লে?

উপায় কী বলুন? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটা তো ভাল অভ্যাস নয়। হয়তো খানাখন্দে পড়ে যাবেন, কিংবা গাছে বা দেয়ালে ধাক্কা খাবেন।

সঙ্গে একটা খোঁড়া লোক ছিল বলছিলে যে!

ছিল। কিন্তু দুজনেরই হাঁটা অনেকটা একরকম। দুজনেই যেন ভেসে-ভেসে যাচ্ছেন। দুজনেই যেন ঘুমন্ত।

গুল মারছ না তো? বজ্রাঙ্গ হঠাৎ সন্দেহের গলায় বলেন।

আঞ্জে না। গুল মারা খুব খারাপ। কলকাতার ছেলেরা মফস্বলে গেলে গুলি মারে বটে, কিন্তু আমি সে-দলে। নই।

আচ্ছ বলে। তুমি তো বাড়ি থেকে বেরোলে--

আজ্ঞে হ্যাঁ। বেরিয়েই আমি দৌড়ে গয়েশবাবুর কাছে পৌছে গিয়ে ডাক দিলাম, গয়েশকা--

থাক থাক, এবার আর ডাকটা শোনাতে হবে না।

পল্টু অভিমানভারে বলে, কাছে গিয়ে তো চেঁচিয়ে ডাকিনি। আস্তে ডেকেছি।

ও। আচ্ছা, বলো।

ডাকলাম। কিন্তু এবারও গয়েশবাবু ফিরে তাকালেন না! তখন আমার স্থির বিশ্বাস হল, গয়েশবাবু জেগে নেই। আমি তখন ওঁদের পেরিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়িয়ে যা দেখতে পেলুম তা আর বলার ভাষা আমার নেই। ওঃ...বাবা রে...

বজ্রাঙ্গ নড়েচড়ে বসে পিস্তলের খাপে একবার হাত ঠেকিয়ে বললেন, কাতুকুতু দিতে হবে নাকি?

না না, বলছি। ভাষাটা একটু ঠিক করে নিচ্ছি। আর কি। দেখলাম কি জানেন? দেখলাম, খোঁড়া লোকটাও গয়েশবাবু, না-খোঁড়া লোকটাও গয়েশবাবু।

তার মানে?

অর্থাৎ, দুজন গয়েশবাবু পাশাপাশি হাঁটছে।

ফের গাঁক করলেন বজ্রাঙ্গ, তা কী করে হয়?

আমারও সেই প্রশ্ন। তা কী করে হয়। আমি চোখ কচলে গায়ে চিমটি দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, চোখের ভুল নয়। দুজনেই গয়েশবাবু। এক চেহারা, এক পোশাক, শুধু দুজনের হাঁটাটা দুরকম।

ঠিক করে বলো। সত্যি দেখেছ, না হ্যালুসিনেশান?

আপনাকে ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি। একেবারে জলজ্যান্ত চোখের দেখা।

তুমি তখন কী করলে?

আমি তখন বহুবচনে বললাম গয়েশকাকারা, 'কোথায় যাচ্ছেন এই নিশুতি রাত্তিরে?' কিন্তু তাঁরা তবু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আমাকে যেন দেখতে পাননি এমনভাবে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

আর তুমি দাঁড়িয়ে রইলে?

পিছোনোর উপায় ছিল না। রাস্তা জুড়ে আমার পিছনে একটা মস্ত ষাঁড় শুয়ে ছিল যে! আমি বললাম, 'কাকারা, থামুন। আপনারা ঘুমের মধ্যে হাঁটছেন।' কিন্তু তাঁরা আমাকে পাত্তাই দিলেন না; সোজা হেঁটে এসে আমাকে ভেদ করে চলে গেলেন।

ভেদ করে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেদ করা ছাড়া আর কী বলা যায়? আমার ওপর দিয়েই গেলেন। কিন্তু এতটুকু ছোঁয়া লাগল না। গয়েশবাবু খোঁড়া গয়েশবাবুকে তখন বলছিলেন...

অস্ফুট একটা 'রাম-রাম' ধ্বনি দিয়ে বজ্রাঙ্গ হুহুংকারে বলে উঠলেন, দ্যাখো, তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি, সরকারি কাজে বাধার সৃষ্টি করা রাজদ্রোহিতার সামিল।

পল্টু অবাক হয়ে বলে, আমি আবার সরকারি কাজে কখন বাধা দিলাম?

বজ্রাঙ্গ চোখ পাকিয়ে বললেন, এই যে ভূতের গল্প বলে তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ এটা সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? আমি ভয় পেয়ে গেলে তদন্ত হবে কী করে?

সকলেরই একটু-আধটু হাসি পাচ্ছে, কিন্তু কেউ হাসতে সাহস পাচ্ছে না; পল্টু করুণ মুখ করে বলল, ঘটনাটা ভৌতিক নাও হতে পারে। হয়তো ও দুটো গয়েশাকাকুর ট্রাই ডাইমেনশনাল ইমেজ।

বজ্রাঙ্গ হুংকর দিলেন, মানে?

পল্টু ভয়ে-ভয়ে বলে, ত্রিমাত্রিক ছবি।

ছবি কখনও হেঁটে বেড়ায়? ইয়ার্কি করছ?

কেন, সিনেমার ছবিতে তো লোকে হাঁটে।

বজ্রাঙ্গ দ্বিধায় পড়ে গেলেন বটে, কিন্তু হার মানলেন না। ঝড়াক করে একটা শ্বাস ফেলে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার স্টেটমেন্ট আর নেওয়া হবে না।

পল্টু মুখখানা কাঁদো-কাঁদো করে বলে, আমি কিন্তু গুল মারছিলাম না। বলছিলাম কী, ঘটনাটা আরও ভাল করে ইনভেসটিগেট করা দরকার। এর পিছনে হয়তো একটা বৈজ্ঞানিক চক্রান্ত আছে।

কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে বজ্রাঙ্গ চতুর্দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে ভ্রূকুটি করে হুংকার ছাড়লেন, আর কারও কিছু বলার আছে? কিন্তু খবর্দার, কেউ গুলগপ্পো ঝাড়লে বিপদ হবে।

কারও কিছু বলার ছিল না। সুতরাং আর একবার কটমট করে চারদিকে চেয়ে বজ্রাঙ্গ বিদায় নিলেন।

বজ্রাঙ্গ বোস বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্টুও সুট করে কেটে পড়েছিল।

গয়েশবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়ার তদন্ত যে এখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠবে, তা ভেবে খুব হাসি পাচ্ছিল তার। কিন্তু শহরে একটা প্রায় শোকের ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রকাশ্য স্থানে দম ফাটিয়ে হাসাটা উচিত হবে না। লোকে সন্দেহ করবে। তাই সে গয়েশবাবুর বাড়ির পিছন দিককার জলার মধ্যে হোগলার বনে গিয়ে ঢুকে পড়ল। জায়গাটা বিপজ্জনক। একে তো বরফের মতো ঠাণ্ডা জল, তার ওপর জলে সাপখোপ আছে, জোঁক তো অগুনতি, পচা জলে বীজাণুও থাকার কথা। কিন্তু হাসিতে পেটটা এমনই গুড়গুড় করছে পল্টুর যে, বিপদের কথা ভুলে সে হোগলার বনে ঢুকে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগল।

কিন্তু আচমকাই হাসিটা থেমে গেল তার; হঠাৎ সে লক্ষ করল, চারদিকে লম্বা লম্বা হোগলার নিবিড় জঙ্গল। এত ঘন যে, বাইরের কিছুই নজরে পড়ে না। সে কলকাতার ছেলে। এইরকম ঘন জঙ্গল সে কখনও দেখিনি। হাঁটু পর্যন্ত জলে সে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু পায়ের নীচে নরম কাদায় ধীরে-ধীরে পা আরও ডেবে যাচ্ছে তার। চারদিকে এই দুপুরেও অবিরল ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। দু-একটা জলচর পাখি ঘুরছে মাথার ওপর। বাইরের কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

পল্টু একটু ভয় খেল। যদিও দিনের বেলা ভয়ের কিছু নেই, তবু কেমন ভয়-ভয় করছিল তার। জলকাদা ভেঙে সে ফিরে আসতে লাগল।

কিন্তু ফিরে আসতে গিয়েই হল মুশকিল। নিবিড় সেই হোগলাবনে কোথা দিয়ে সে ঢুকেছিল, তা গুলিয়ে ফেলেছে। যেদিক দিয়েই বেরোতে যায়, সেদিকেই শুধু জলা আর

আরও হোগলা। আর জলাটাও বিদঘুটে। এতক্ষণ হাঁটুজল ছিল, এখন যেন জলটা হাঁটু ছাড়িয়ে আরও এক বিঘত উঠে এসেছে। পায়ের নীচে পাঁক আরও আঠালো।

কলকাতার ছেলে বলে পল্টুর একটু দেমাক ছিল। সে চালাক চতুর এবং সাহসীও বটে। কিন্তু এই হোগলাবনে পথ হারিয়ে সে দিশাহারা হয়ে গেল। পাঁকের মধ্যে পা ঘেঁষে পাঁকাল মাছ বা সাপ গোছের কিছু সড়াত করে সরে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, আর চমকে উঠছে পল্টু। হোগলার বনে উত্তরের বাতাসে একটা হু হু শব্দ উঠছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে সে লোকালয়ের শব্দ শুনবার চেষ্টা করল। কোনও শব্দ কানে এল না।

পল্টু চেঁচিয়ে ডাকল, মামা! ও মামা!

কারও সাড়া নেই।

পল্টু আরও জোরে চেঁচাল, কে কোথায় আছ? আমি বিপদে পড়েছি।

তবু কারও সাড়া নেই। এদিকে জলার জল পল্টুর কোমর-সমান হয়ে এল প্রায়। কাদা আরও গভীর। ভাল করে হাঁটতে পারছে না পল্টু। হোগলার বন আরও ঘন হয়ে আসছে। দিনের বেলাতেও নাড়া খেয়ে জলার মশারা হাজারে হাজারে এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে। পায়ে জোঁকও লেগেছে, তবে জোঁক লাগলে কেমন অনুভূতি হয় তা জানা নেই বলে রক্ষা। দু' পায়ের অন্তত চার জায়গায় মৃদু চুলকুনি আর সুড়সুড়ির মতো লাগছে। কিন্তু সেই জায়গাগুলো আর পরীক্ষা করে দেখল না পল্টু।

পল্টু প্রাণপণে হোগলা সরিয়ে সরিয়ে এগোতে থাকে। জল ভেঙে হাঁটা ভারী শক্ত। পায়ের নীচে থকথকে কাদা থাকায় হাঁটাটা দুগুণ শক্ত হয়েছে। পল্টু এই শীতেও ঘামতে লাগল। কিন্তু থামলে চলবে না। এগোতে হবে। যেদিকেই হোক, ডাঙা জমিতে কোনওরকমে গিয়ে উঠতে পারলে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।

পল্টু যত এগোয় তত জল বাড়ে। ক্রমে তার বুক সমান হয়ে এল। সে সাঁতার জানে বটে, কিন্তু এই হোগলাবনে সাঁতার জানলেও লাভ নেই। হাত পা ছুড়ে তো আর জলে ভেসে থাকা সম্ভব নয়।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর থাকায় দিক নির্ণয়ও করতে পারছিল না সে। এই সময়ে উত্তরের হাওয়া বয়। হোগলাবনেও সেই হাওয়ার ঝাপট এসে লাগছে বটে, কিন্তু কোন দিক থেকে আসছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

জল যখন প্রায় গলা অবধি পৌঁছে গেছে, তখন থেমে একটু দম নিল পল্টু। এরকম পঙ্কিল ঘিনঘিনে পচা জলে বহুক্ষণ থাকার। ফলে তার সারা গা চুলকোচ্ছে। তার সঙ্গে মশা আর জোঁকের কামড় তো আছেই। শামুকের খোল, ভাঙা কাচ, পাথরের টুকরোয় তার দুটো পায়েরই তলা ক্ষতবিক্ষত। ভীষণ তেষ্টায় গলা অবধি শুকিয়ে কাঠ। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। মাথা ঝিম ঝিম করছে, শরীরটা ভেঙে আসছে পরিশ্রমে।

হঠাৎ সে হোগলাবনে একটা সড়সড় শব্দ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে জল ভাঙার শব্দ। কেউ কি আসছে?

পল্টু কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আমি বড় বিপদে পড়েছি। কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন?

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা গম্ভীর গলা জবাব দিল, যেখানে আছ সেখানেই থাকে। আমি আসছি।

পল্টু তবু বলল, আমি এখানে।

তুমি কোথায় তা আমি জানি। কিন্তু নোড়ো না। তোমার সামনেই একটা দহ আছে। দহে পড়লে ডুবে যাবে।

পল্টু একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল। হোগলা পাতার ঘন বনে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু শব্দটা যে এগিয়ে আসছে তার দিকে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। খুব কাছেই গাছগুলোর ডগা নড়তে দেখল সে। উৎসাহের চোখে দু-তিন পা এগিয়ে গেল সে। চেঁচিয়ে বলল, এই যে আমি।

কিন্তু এবার আর সাড়া এল না। আস্তে আস্তে গাছগুলো ঠেলে একটা সরু ডিঙির মুখ এগিয়ে আসে তার দিকে। খুব ধীরে ধীরে আসছে।

পল্টু অবাক হয়ে দেখল, ডিঙিটায় কোনও লোক নেই। নিতান্তই ছোট্ট ডিঙি লম্বায় তিন হাতও বোধহয় হবে না। আর ভীষণ সরু। ব্যাপারটা অদ্ভুত। লোকছাড়া একটা ডিঙি কী করে এই ঘন হোগলাবনে চলছে? ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি?

গভীর স্বরটা একটু দূর থেকে বলে উঠল, ভয় নেই, উঠে পড়ে। সাবধানে ওঠো। ডিঙি ডুবে যেতে পারে। সরু ডগার দিকটা ধরে যেভাবে লোকে ঘোড়ার পিঠে ওঠে, তেমনি করে ওঠো!

কাণ্ডটা ভুতুড়ে হোক বা না হোক, সেসব বিচার করার মতো অবস্থা এখন পল্টুর নয়। সে বার কয়েকের চেষ্টায় ডিঙির ওপর উঠে পড়তে পারল। একটু দুলে ডিঙিটা আবার সোজা এবং স্থির হল।

পল্টু প্রথমেই দেখতে পেল, তার পায়ে অন্তত দশ বারোটা জোঁক লেগে রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে আছে। ভয়ে সে একটা অস্ফুট। চিৎকার করে উঠল। আঙুলে চেপে ধরে যে জোঁকগুলোকে ছাড়াবে সেই সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। গা ঘিনঘিন করতে লাগল তার। পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, জলে ভিজে। সাঁতা হয়ে কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়া। আর ভেজা পোশাকে শীতের হাওয়া লাগতেই ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে।

কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতে ভয়ে তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। ডিঙিটায় উঠবার মিনিটখানেক বাদে আচমকাই সেটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলতে লাগল।

ভূত! ভূত! পল্টু চেঁচাল।

হাত দশেক দূর থেকে সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, ভূত নয় পল্টু। ভয় খেও না। তোমার ডিঙিটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে আর একটা নৌকের সঙ্গে।

পল্টু ছুঁকে দেখল, কথাটা মিথ্যে নয়। ডিঙিটার নীচের দিকে একটা লোহার আংটা লাগানো। তাতে দড়ি বাঁধা। দড়িটা টান টান হয়ে আছে। অর্থাৎ কেউ টেনে নিচ্ছে ডিঙিটাকে।

সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? জবাবে পাল্টা একটা প্রশ্ন এল, আগে বলো কাল রাত্রে তুমি

সত্যিই গয়েশবাবুকে দেখেছিলে কি না।

পল্টু একটু চমকে উঠল। এখন আর মিথ্যে কথা বলার মতো অবস্থা তার নয়।

পল্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, দেখেছি। তবে দারোগাবাবুকে যা বলেছি তা ঠিক নয়।

তুমি একটু ফাজিল, তাই না?

পল্টু চুপ করে রইল। হোগলাবনের ভিতর দিয়ে তার ডিঙি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না সে। সামনের নৌকোয় কে রয়েছে, বন্ধু না শত্রু, তাই বা কে বলে দেবে?

গয়েশবাবুর খুন বা নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাটা যে খুব এলেবেলে ব্যাপার নয়, তা একটু একটু বুঝতে পারছিল পল্টু। বুঝতে পেরে তার শরীরের ভিতর গুড়গুড়িয়ে উঠছিল একটা ভয়। জলার মধ্যে হোগলাবনের গোলকধাঁধা থেকে কোন অশরীরী তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে?

হোগলাবনটা একটু হালকা হয়ে এল। এর মধ্যে নৌকো চালানো খুব সহজ কাজ নয়। যে নৌকোটা তার ডিঙিটাকে টেনে নিচ্ছে, তার চালকের এতক্ষণে হাঁফিয়ে পড়ার কথা।

বন ছেড়ে জলার মাঝ-মধ্যিখানে ক্রমে চলে এল পল্টুর ডিঙি। ফাঁকায় আসতেই সে সামনের নৌকোটা দেখতে পেল। মাত্র হাত দশেক সামনে বাইচ খেলার সরু লম্বা নৌকোর মতো একটা নৌকো। খুব লম্বা, সাদা। তাতে একটিই লোক বসে আছে, আর পল্টুর দিকে মুখ করেই। গায়ে একটা লম্বা কালো কোট। কিন্তু মুখটা? পল্টুর শরীরে একটা ঠাণ্ডা ভয়ের সাপ জড়িয়ে গেল। বুকটা দমাস-দমাস করে শব্দ করতে লাগল। লোক নয়। কোট-পরা একটা সিংহ। পল্টু হয়তো আবার জলায় লাফিয়ে পড়ত। কিন্তু সামনের নৌকো থেকে সেই সিংহ গম্ভীর গলায় বলল, ভয় পেও না। আমার মুখে একটা রবারের মুখোশ রয়েছে।

পল্টুর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। অনেক কষ্টে সে জিজ্ঞেস করল, কেন?

আমার মুখটা দেখতে খুব ভাল নয় বলে।

কথাটা পল্টুর বিশ্বাস হল না। ভয়ে ভয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, দেখতে ভাল নয় মানে?

নৃসিংহর দু হাতে দুটো বৈঠা। খুব অনায়াস ভঙ্গিতে নৃসিংহ তার লম্বা নৌকোটাকে জলার ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোনও ক্লান্তি বা কষ্টের লক্ষণ নেই। এমন কি তেমন একটা হাঁফাচ্ছেও না। স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার মুখে একবার অ্যাসিড লেগে অনেকখানি পুড়ে যায়। খুব বীভৎস দেখতে হয় মুখটা। সেই থেকে আমি মুখোশ পরে থাকি।

সিংহের মুখোশ কেন?

আমার অনেক রকম মুখোশ আছে। যখন যেটা ইচ্ছে পরি। তুমি অত কথা বোলো না। জিরোও।

পল্টু জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

জলার ওদিকে।

ওদিকে মানে কি শহরের দিকে?

না। উল্টোদিকে।

কেন?

একজনের হুকুমে।

কিসের হুকুম?

তিনি কে?

তা বলা বারণ। অবশ্য আমিও তাকে চিনি না।

আপনি কে?

আমি তো আমিই।

আমি যাব না। আমাকে নামিয়ে দিন।

এই জলায় কুমির আছে, জানো?

থাকুক। আমি নেমে যাব। আমাকে নামতে দিন।

তুমি ভয় পেয়েছ। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই।

আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। মামা ভাবছে। আমি বাড়ি যাব।

যেখানে যাচ্ছ সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তোমার মামা এতক্ষণে তোমার খবর পেয়ে গেছে। ওসব নিয়ে ভেবো না। আমরা কাঁচা কাজ করি না।

আমাকে নিয়ে গিয়ে কী করবেন?

কিছু নয়। বোধহয় তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হবে। তারপর ছাড়া পাবে।

কিসের প্রশ্ন?

বোধহয় গয়েশবাবুকে নিয়ে। কিন্তু আর কথা নয়।

পল্টু শুনেছে জলার মাঝখানে জল খুব গভীর। কুমিরের গুজবও সে জানে। আর জলায় ভূত-প্রেত আছে বলেও অনেকের ধারণা। সেসব বিশ্বাস করে না পল্টু। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, জলাটা খুব নিরাপদ জায়গা নয়।

ধুধু করছে সাদা জল। শীতকালেও খুব শুকিয়ে যায়নি। তবে এখানে-ওখানে চরের মতো জমি জেগে আছে। তাতে জংলা গাছ। প্রচুর পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়েছে, ছোঁ মেরে মাছ তুলে নিচ্ছে জল থেকে। ভারী সুন্দর শান্ত চারদিক। আলোয় ঝলমলে। তার মাঝখানে বাচ-নৌকোয় ওই নৃসিংহ লোকটা ভারী বেমানান। তেমনি রহস্যময় তার এই নিরুদ্দেশ-যাত্রা।

গলা খাঁকারি দিয়ে পল্টু জিজ্ঞেস করল, আর কত দূর? এসে গেছি। ওই যে দেখছি বড় একটা চর, ওইট। চরটা দেখতে পাচ্ছিল পল্টু। খুব বড় নয়। লম্বায় বোধহয় একশো ফুট হবে। তবে অনেক বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গল আছে। বেশ অন্ধকার আর রহস্যময় দেখাচ্ছিল এই ফটফটে দিনের আলোতেও; কোনও লোকবসতি নেই বলেই মনে হয়।

পল্টুর ভয় খানিকটা কেটেছে। একটু মরিয়া ভাব এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, ওখানেই কি তিনি থাকেন?

থাকেন না, তবে এখন আছেন। বলতে বলতে লোকটা তার লম্বা নৌকোটাকে বৈঠার দুটো জোরালো টানে অগভীর জলে চরের একেবারে ধারে নিয়ে তুলল। জলের

নীচের জমিতে নৌকের ঘষটানির শব্দ হল। লোকটা উঠে এক লাফে জলে নেমে বলল, এসো।

দড়ির টানে পল্টুর ডিঙিটাও বাচ-নৌকোর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পল্টু নেমে দেখল, জল সামান্যই। এদিকে হোগলাবন নেই। জল টলটলে পরিষ্কার এবং একটু স্রোতও আছে। সে শুনেছে। এদিকে বড় গাঙের সঙ্গে জেলার একটা যোগ আছে। সম্ভবত তারা সেই গাঙের কাছাকাছি এসে গেছে।

নৃসিংহ খাড়াই পার বেয়ে ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। লোকটা খুব লম্বা নয় বটে, তবে বেশ চওড়া। গায়ে কোট থাকলেও বোঝা যাচ্ছিল, লোকটার স্বাস্থ্য ভাল এবং পেটানো, হওয়াই স্বাভাবিক। এতটা রাস্তা দুটো বৈঠার জোরে দু'খানা নৌকো টেনে আনা কম কথা নয়।

পল্টু ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে এল। লোকটা তার কাছ থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে জঙ্গলটার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, এগিয়ে যাও।

কোথায় যাব?

সোজা এগিয়ে যাও, ওখানে লোক আছে, নিয়ে যাবে।

একটু ইতস্তত করল পল্টু। জঙ্গলের দিকে কোনও রাস্তা নেই। বিশাল বড় বড় গাছ, লতাপাতা বুক-সমান আগাছায় ভরা। শুধু পাখির ডাক আর গাছে বাতাসের শব্দ। জঙ্গলটা খুবই প্রাচীন। কিন্তু লোকবসতির কোনও চিহ্ন নেই। এই জঙ্গলে কে তার জন্য অপেক্ষা করছে? কী প্রশ্নই বা সে করতে চায়? গয়েশবাবু সম্পর্কে তার জানার এত আগ্রহই বা কেন?

দোনোমোনো করে পল্টু এগোল। একবার নৃসিংহের দিকে আচমকাই ফিরে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল, নৃসিংহের হাতে একটা কালো রঙের বল। লোকটা ধীরে-ধীরে হাতটা ওপরদিকে তুলছে।

এত অবাক হয়ে গিয়েছিল পল্টু যে, হাঁ করে তাকিয়ে রইল, মুখে কথা এল না। বল কেন লোকটার হাতে?

লোকটা ধমকে উঠল, কী হ'ল?

বল নিয়ে আপনি কী করছেন?

কিছু নয়। যা বলছি করো। এগোও।

পল্টু মুখ ফিরিয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই মাথার পিছনে দুম করে কী একটা এসে লাগল।

সেই বলটা? ভাবতে-না-ভাবতেই তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সে। পেটে চিনচিনে খিদে; শীত আর ভয়ে এমনিতেই তার শরীর কাঁপছিল। মাথায় বলটা এসে লাগতেই শরীরটা অবশ হয়ে পড়ে যেতে লাগল মাটিতে। হাত বাড়িয়ে শূন্যে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল পল্টু। কিছু পেল না।

অজ্ঞান হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দুপুরে খেতে বসে সুমন্তবাবু বললেন, ব্যায়াম। ব্যায়াম। ব্যায়াম ছাড়া কোনও পন্থা নেই। ব্যায়াম না করে করেই বাঙালি শেষ হয়ে গেল। বিকেল থেকে পাঁচশো স্কিপিং শুরু করো সান্টু। মঙ্গল, তুমি ব্যায়ামবীর বটে, কিন্তু ফ্যাট নও। শরীরে কেবল মাংস জমালেই হবে না, বিদ্যুতের মতো গতিও চাই। গতিই আর একটা শক্তি। আজ বিকেল থেকে তুমি গতি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবে। কমলা, তুমি আর তোমার মাকে নিয়েই আমার প্রবলেম। তোমরা কপালগুণে মেয়েমানুষ। শাস্ত্রে মেয়েদের ব্যায়ামের কথা নেই। কিন্তু শহরে বিপদ দেখা দিয়েছে, সকলেরই খানিকটা শক্তিবৃদ্ধি দরকার। আমাদের ঢেঁকিটা আজকাল ব্যবহার হয় না। আমার মা ওই ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে-দিয়ে বুড়ো বয়স পর্যন্ত শুধু বেঁচেই আছেন যে তাই নয়, খুবই সুস্থ আছেন। একবার আমাদের বাড়িতে দু'দুটো চোরকে ধরে তিনি মাথা ঠুকে দিয়েছিলেন। সুতরাং আজ থেকে তুমি আর তোমার মা ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করো। ওফ, কাঁকালে বড় ব্যথা। বলে সুমন্তবাবু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন।

কুমুদিনী দেবী বললেন, তা না হয় হল, কিন্তু ব্যায়াম করে গায়ে জোর হতে তো সময় লাগে। ততদিনে যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যায়? তার চেয়ে আমি বলি কী, একটা কুকুর পোষো।

সুমন্তবাবু বললেন, সেটা মন্দ বুদ্ধি নয়। বজ্রাঙ্গীবাবুর সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, গয়েশবাবু খুনই হয়েছেন। লাশটা হয়তো জলায় ফেলে দিয়েছে। গয়েশবাবু খুন হলেন কেন তা পরে জানা যাবে। আমার ধারণা, গয়েশবাবুর লেজটাই তার মৃত্যুর কারণ। আমাদের লেজ নেই বটে, কিন্তু অন্যরকম ডিফেক্ট থাকতে পারে। সান্টুর নাকটা লম্বা, মঙ্গলের কপালের দুদিকটা বেশ উঁচু, অনেকটা শিং-এর মতো, আমার অবশ্য ওরকম কোনো ডিফেক্ট নেই, তাহলেও..

আছে। গম্ভীরভাবে কমলা বলল।

আছে? বলে অবাক হয়ে সুমন্তবাবু মেয়ের দিকে তাকলেন।

তোমার গায়ে মস্ত-মস্ত লোম। বনমানুষের মতো।

সুমন্তবাবু তাড়াতাড়ি ভাত মাখতে-মাখতে বললেন, যাক সে কথা। বজ্রাঙ্গবাবু বলেছেন দি কিলার উইল স্ট্রাইক এগেন। আমাকে সতর্ক থাকা দরকার।

ঠিক এই সময়ে বাইরে একটা হৈ চৈ শোনা গেল। কে যেন ঢোল বাজাচ্ছে আর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কী বলছে।

সান্টু লাফিয়ে উঠে বাইরে ছুটল। পিছনে সুমন্তবাবু, মঙ্গল, কমলা, কুমুদিনী।

দেখা গেল, নাপিত নেপাল সুমন্তবাবুর ফটকের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, দুয়ো দুয়ো, হেরে গেল।

সুমন্তবাবু হেঁকে বললেন, কে হেরে গেল রে ন্যাপলা! বলি ব্যাপারখানা কী?

নেপাল ঢোল থামিয়ে একগাল হেসে বলল, আজ্ঞে এবার আর আমার সঙ্গে পারবেন না। একেবারে কাকের মুখ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। সকালবেলা খুব জব্দ করেছিলেন আজ। গয়েশবাবুর খবরটা সবে গঙ্গাগোবিন্দবাবুকে দিতে যাচ্ছিলুম। সেই সময় আপনি এমন হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন যে, আমি একেবারে চুপসে গেলুম। কিন্তু এবার আমি মার দিয়া কেল্লা।

সুমন্তবাবু ভাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন, বলছিস কী রে ন্যাপলা? আবার কিছু ঘটেছে নাকি?

নেপাল ঢোলে চাঁটি মেরে চাটিস-চাটিস বোল বাজিয়ে কিছুক্ষণ নেচে নিয়ে বলল, ঘটেছে বই কী। এই একটু আগে পল্টুকে পরীরা ধরে নিয়ে গেছে।

পরীরা ধরে নিয়ে গেছে কী রে।

তবে আর বলছি কী, আমার পিসশ্বশুরের স্বচক্ষে দেখা। পল্টু দারোগাবাবুর সামনে সাক্ষী দিয়ে জলার ধারে গিয়েছিল। সেখানে ঠিক সাতটা মেয়ে-পরী এসে তাকে ছেঁকে ধরে। আমার পিসশ্বশুর জলায় মাছ ধরতে গিয়েছিল। নিজের চোখে দেখেছে, সাতটা পরী পলুটুকে ধরে নিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে মেঘের দেশে।

সুমন্তবাবু এঁটো হাত ঘাসে মুছে নিয়ে শশব্যাস্তে বললেন, তাহলে তো খবরটা সবাইকে দিতে হচ্ছে।

একগাল হেসে নেপাল বলে, আজ্ঞে সে-কাজ আমি সেরেই এসেছি। কারও আর জানতে বাকি নেই।

সুমন্তবাবু বাস্তবিকই একটু দমে গেলেন। এত বড় একটা খবর, সেটা তিনি কিনা পেলেন সবার শেষে! কিন্তু কী আর করেন। দাঁত কিড়মিড় করে শুধু বললেন, আচ্ছা, দেখা যাবে। কী দেখা যাবে, কী ভাবে দেখা যাবে তা অবশ্য বোঝা গেল না। তবে সুমন্তবাবু আর খেতে বসলেন না; গায়ে জামা চড়িয়ে, পায়ে একজোড়া গামবুট পরে এবং মাথায় চাষিদের একটা টোকলা চাপিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সান্টু আর মঙ্গল আবার খেতে বসে গিয়েছিল। কুমুদিনী দেবী একটু নিচু গলায় তাদের বললেন, ওরে, ওই দ্যাখ, বাড়ির কর্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। এই দুপুরে বিকট এক সাজ করে কোথায় যেন চললেন। তোরাও একটু সঙ্গে যা বাবারা। কোথায় কী ঘটিয়ে আসেন বলা যায় না।

সান্টু আর মঙ্গল শেষ কয়েকটা গ্রাস গপগপ গিলে উঠে পড়ল। সান্টু তার গুলতি আর মঙ্গল একটা মাছ মারার ট্যাঁটা হাতে নিয়ে সুমন্তবাবুর পিছনে দৌড়োতে থাকে।

জলার ধারে পৌঁছে খুবই বিরক্ত হলেন সুমন্তবাবু। এমনিতেই জলাটা নির্জন জায়গা, তার ওপর ভূতপ্রেত আছে বলে সহজে লোকে এদিকটা মাড়ায় না। কিন্তু আজ জলার ধারে রথযাত্রার মতো ভিড়। বোঝা গেল, নেপাল ভালমতোই খবরটা চাউর করেছে। জেলেদের যে কটা নৌকো ছিল, সব জলে দাবড়ে বেড়াচ্ছে। বহু লোক হোগলাবনে কোমরাসমান জলে নেমে গাছ উপড়ে ফেলছে!

কবি সদানন্দ একটু হাসি-হাসি মুখ করে সুমন্তবাবুকে বললেন, ছেলেটা খুব ডেপো ছিল মশাই। আমার কবিতায় ভুল ধরেছিল। তখনই জানতাম, ছোকরা বিপদে পড়বে।

কার কথা বলছেন? পল্টু?

তবে আর কে! আলোকবর্ষ নাকি বছর-টছর নয়। তা নাই বা হল, তা বলে মুখের ওপর ফস করে বলে বসবি? আর তোর চেয়ে সায়েন্স-জানা লোক কি এখানে কম আছে? এই তো গঙ্গাগোবিন্দবাবুই রয়েছেন। উনিই তো বললেন, আলোর গতি মোটেই সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল নয়। বেশ কিছু কম।

বলতে বলতেই গঙ্গাগোবিন্দ এগিয়ে এলেন। মাথা চুলকোঁতে চুলকোতে বললেন, আহাহা, এখন আবার ওসব কথা কেন?

সুমন্তবাবু একটু ভাবাচ্যাক খেয়ে গিয়েছিলেন। আলোকবর্ষ বা আলোর গতির প্রসঙ্গটা ধরতে পারছিলেন না। একটু সামলে নিয়ে বললেন, পল্টুর ঠিক কী হয়েছে জানেন আপনারা?

গঙ্গাগোবিন্দ মাথা নেড়ে বললেন, না। কয়েকজন লোক তাকে জলার দিকে আসতে দেখেছে। তারপর কী ঘটেছে, তা অনুমান করা যায় মাত্র। কলকাতার ছেলে, সাঁতার জানত না, মনে হয় ডুবেই গেছে।

সর্বনাশ! বলে সুমন্তবাবু এগিয়ে গেলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পল্টু এমনি-এমনি গায়েব হয়নি। গয়েশবাবু সম্পর্কে সে কিছু গুরুতর তথ্য জানতে পেরেছিল। গয়েশবাবুকে যারা খুন, বা গুম করেছে, সম্ভবত তারাই পল্টুকেও খুন, বা গুম করেছে।

জলার ধারে লোকজনের ভিড় হওয়াতে কয়েকজন দিব্যি ব্যবসা কেঁদে বসে গেছে। হরিদাস পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে-নেচে তার বুলবুলভাজা বিক্রি করছে, কানাই তার ফুচকার ঝুড়ি নামিয়েছে একটা শিমুলগাছের তলায়, চিনেবাদাম বিক্রি করতে লেগেছে ষষ্ঠীপদ। ওদিকে জেলেরা বেড়াজাল ফেলে জলায় পল্টুর মৃতদেহ খুঁজছে। দারোগাবাবু একটা আমগাছের তলায় ইজিচেয়ারে বসে নিজে তদারক করছেন।

সুমন্তবাবু বুঝলেন, এই ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে কোনও লাভ হবে না। তিনি সান্টু আর মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার মনে হয় রহস্যের উত্তর গয়েশবাবুর বাড়ির মধ্যেই পাওয়া যাবে। আমি গোপনে বাড়ির মধ্যে ঢুকছি, তোরা চারদিকে নজর রাখিস।

গয়েশবাবুর বাড়িটা আজ বড়ই ফাঁকা। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে চাকরিটা পর্যন্ত জলার ধারে গিয়ে মজা দেখছে। সুতরাং সুমন্তবাবুর ধরা পড়ার ভয় বড় একটা নেই।

বাড়িতে ঢোকা খুব একটা শক্ত হল না। পুরনো বাড়ি বলে অনেক জানালা-দরজাই নড়বড় করছে। সুমন্তবাবু একটা আধাখোলা জানালার গরাদহীন ফোকর দিয়ে গামবুট এবং টোকলাসহই ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

নীচে এবং ওপরে অনেকগুলো ঘর। তার সবগুলোই ফাঁকা পড়ে আছে। গয়েশবাবু শুধু সামনের দিকের দুখানা ঘর ব্যবহার করতেন। বাকি ঘরগুলোয় তালাও দেওয়া নেই। ডাঁই-করা কিন্তু ভাঙা আসবাব, তোরঙ্গ আর হাবিজাবি জিনিস রয়েছে। মাকড়সার জাল, ধুলো, ইঁদুর আর আরশোলার নাদিতে ভরতি।

সুমন্তবাবু প্রথম ঘরটায় ঢুকেই চারদিকে চেয়ে বুঝলেন, এ ঘরে বহুকাল লোক ঢোকেনি। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ।

কিন্তু সুমন্তবাবু লক্ষ করলেন, ধুলোর ওপর নির্ভুল একজোড়া জুতোর ছাপ রয়েছে। রবারসোলের জুতো। লাঠিটা শক্ত হাতে চেপে ধরে তিনি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললেন। ওপাশে আর একটা ঘর; অনেক-দেরাজওলা একটা মস্ত চেস্ট রয়েছে। ভাঙা আলনা; একটা লোহার সিন্দুক। সুমন্তবাবু দেরাজগুলো খুলে দেখলেন, তাতে পুরনো খবরের কাগজ আর কিছু লাল হয়ে যাওয়া চিঠিপত্র ছাড়া কিছুই নেই। সিন্দুকটা খুলতে পারলেন না। তালা লাগানো। পরের ঘরটাতে একটা মস্ত কাঠের বাক্স। সেটা খুলে দেখলেন,

রাজ্যের ছেড়া কাঁথা কাপড় আর ভাঙা বাসন। পরের ঘরটায় কয়েকটা বইয়ের আলমারি। পাল্লা খুলে কয়েকটা বই একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন সুমন্তবাবু। ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলেন সুমন্তবাবু। ‘গুপ্তহিরার রহস্য’। দস্যুসর্দার কালোমানিক সুবর্ণগড় থেকে বিখ্যাত গুপ্তহিরা লুঠ করে নিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ অবধি গোয়েন্দা জীমূতবাহন তা উদ্ধার করে। কিন্তু কালোমানিক তাকে হুমকি দিয়েছিল, শোধ নেবে। জীমূতবাহন যখন এক রাত্রে ঘুমোচ্ছিল তখন জানালায় শব্দ হল টক। জীমূত জানালা খুলে দেখে, কাঠের পাল্লায় একটা তীর গেঁথে আছে। তীরের ফলায় গাঁথা চিঠি : শিগগিরই দেখা হবে। কালোমানিক। ‘গুপ্তহিরার রহস্য’ প্রথম খণ্ড সেখানেই শেষ। অনেক চেষ্টা করেও বইটার দ্বিতীয় খণ্ড যোগাড় করতে পারেননি সুমন্তবাবু। কিন্তু এতকাল পরে গয়েশবাবুর বাড়িতে আলমারি খুলে তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। দ্বিতীয় তাকে কোণের দিকে তৃতীয় বইখানাই ‘গুপ্তহিরার রহস্য’ (দ্বিতীয় খণ্ড)।

সুমন্তবাবু বইটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে কোঁচা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করলেন। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। কালোমানিক আবার ফিরে আসছে। পড়তে পড়তে সুমন্তবাবুর বাহ্যজ্ঞান রইল না।

যদি বাহ্যজ্ঞান থাকত তাহলে তিনি ভিতরদিককার দরজার পাল্লায় ক্যাঁচ শব্দটা ঠিকই শুনতে পেতেন। কিন্তু পেলেন না।

দরজার আড়াল থেকে একজোড়া চোখ তাঁকে লক্ষ করল। তারপর ছায়ামূর্তির মতো একটা লোক নিঃশব্দে ঢুকল দরজা দিয়ে।

সুমন্তবাবু মাথার টোকলটা খুলতে ভুলে গেছেন। গামবুটও পায়ে রয়েছে। ছায়ামূর্তি পিছন থেকে তাঁকে জ্বলজ্বলে চোখে খানিকক্ষণ দেখলে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

সুমন্তবাবু তেরো পৃষ্ঠা পড়ে পাতা উল্টে চৌদ্দ পৃষ্ঠায় গেছেন মাত্র। সুবর্ণগড়ের রাজবাড়ির বিশ হাত উঁচু দেয়াল টপকে একজন লোক কাঠবেড়ালির মতো লাফ দিয়ে আমগাছের ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মাটিতে নামল!

ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে লোকটা লাফিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ে।

ভাগ্যিস টোকলটা মাথা থেকে খোলেননি। যেরকম জোরে তিনি চেয়ার থেকে মাটিতে ছিটকে পড়েছিলেন তাতে মাথা ফেটে যাওয়ার কথা। ফাটল না টোকলটার জন্যই। বুকের ওপর একটা লোক চেপে বসে বলছে, হুঁ হুঁ বাছাধন, এবার?

সুমন্তবাবুর সারা গায়ে ব্যথা। অনভ্যাসের ব্যায়াম করলে যা হয়। তবু তিনি ঝটকা মেরে উঠতে গেলেন এবং দুজনে জড়োজড়ি করে মেঝেয় গড়াতে লাগলেন। সুমন্তবাবুর মনে হচ্ছিল, একটু ভুল হচ্ছে। ভীষণ ভুল।

আগন্তুক লোকটাও যেন তার ভুল বুঝতে পেরেছে। হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, সুমন্তবাবু না?

সুমন্তবাবুও বলে উঠলেন, আরো! মৃদঙ্গবাবু যে!

গা-হাত ঝেড়ে উঠে মৃগাঙ্গবাবু বললেন, আর বলেন কেন! এসেছিলাম গয়েশবাবুর ছেলেবেলার কোনো ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না তা খুঁজে দেখতে।

ফোটোগ্রাফ? তা দিয়ে কী হবে?

গবেষণায় লাগবে গয়েশীবাবুর লেজ সংক্রান্ত গুজবটা সত্যি কি না তা আজ অবধি ধরতে পারলাম না। অথচ বেশ জোরালো গুজব! যদি সত্যি হয় তবে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে একটা মস্ত ওলট-পালট ঘটে যাবে। তাই দেখছিলাম। যদি গয়েশবাবুর একেবারে ছেলেবেলার কোনো ছবি থাকে, আর তাতে যদি লেজের প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকটাকে তো আর পাওয়া যাবে না।

সুমন্তবাবু একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, শহরে এতবড় একটা বিপর্যয় চলছে, আর আপনি খুঁজছেন গয়েশবাবুর লেজ! জানেন পল্টুকে গুম করা হয়েছে?

মৃদঙ্গবাবু গভীর হয়ে বললেন, জানি। কিন্তু গয়েশবাবুর লেজটাও কিছু কম গুরুতর ব্যাপার নয়।

সুমন্তবাবু খুব উত্তেজিত গলায় বললেন, তাহলে আমার কাছে শুনুন। গয়েশবাবুর মোটেই লেজ ছিল না।

মৃদঙ্গবাবুও উত্তেজিত গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি তা জানলেন কী করে?

দুজনের যখন বেশ তর্কাতর্কি লেগে পড়েছে, তখন হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়ার মতো শব্দ হল! কী হচ্ছে এখানে? অ্যাঁ! কী হচ্ছে?

দুজনেই চেয়ে দেখেন, দরজায় বজ্রাঙ্গবাবু দাঁড়িয়ে। দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, দাঁত কিড়মিড় করছেন। সুমন্তবাবু আর মৃদঙ্গবাবু সঙ্গে-সঙ্গে মিইয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

বজ্রাঙ্গ অত্যন্ত কটমট করে দুজনের দিকে চেয়ে বললেন, অনধিকার প্রবেশের জন্য আপনাদের দুজনকেই অ্যারেস্ট করছি। বলেই পিছু ফিরে হুংকার দিলেন, এই, কে আছিস?

সুমন্তবাবু চোখের পলকে দৌড় দিলেন। খোলা জানালা গলে একলাফে বাগানে নেমে ছুটে গিয়ে হোগলাবনে ঢুকে বিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পড়ার পর খেয়াল হল, তিনি একা নন। মৃদঙ্গবাবুও জলে ঝাঁপ দিয়েছেন।

সুমন্তবাবুর পাশাপাশি কোমরজলে দাঁড়িয়ে মৃদঙ্গবাবু বললেন, আমি সাঁতার জানি না।

আমি জানি।

তাতে আমার কী লাভ?

আপনার লাভের কথা তো বলিনি। বলেছি। আমি সাঁতার জানি।

আমি ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস জানি।

তাতে আমার কী?

আপনার কথা তো বলিনি। বললাম, আমি জানি।

আমি কূমার্সন জানি।

আমি ইভোলিউশন থিওরি জানি।

আমি হাঁফানির ওষুধ জানি।

আমি ব্যাঙের মেটাবলিজম জানি।

এ সময়ে অদূরে একটা বজ্র-হুংকার শোনা গেল, পাকড়ো! জলদি পকাড়কে লাও।

সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন হোগলাবনের আড়ালে বিলের পর থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

সুমন্তবাবু প্রমাদ গুনে তৎক্ষণাৎ গভীর জলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে সাঁতার দিতে লাগলেন।

পিছন থেকে করুশ গলায় মৃদঙ্গবাবু বললেন, সুমন্তবাবু, আমি রয়ে গেলাম যে।

সুমন্তবাবু বললেন, আপনি পুলিশকে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস আর ব্যাঙের মেটাবলিজম বোঝাতে থাকুন।

মৃদঙ্গবাবু করুণতর স্বরে বললেন, আমাদের বংশে যে কেউ কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। আমি পড়লে বংশের কলঙ্ক হবে যে!

আমার বংশেও কেউ পড়েনি।

আপনি ভীষণ স্বার্থপর।

আপনিও খুব পরোপকারী নন।

হোগলাবন চিরে সিপাইটা এগিয়ে আসছে। কিন্তু মৃদঙ্গবাবুর কিছুই করার নেই। তিনি লজ্জায় চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুলিশের হাতে নিজের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনাটা তিনি স্বচক্ষে দেখতে পারবেন না।

টের পেলেন পুলিশটা এসে তাঁর হাত ধরল। মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, চলো বাবা সেপাই, শ্রীঘরে ঘুরিয়ে আনবে চলে।

মৃদুস্বরে কে যেন বলল, চলুন।

গলাটা পুলিশের বলে মনে হল না। সাবধানে চোখটা একটু খুলে মৃদঙ্গবাবু দেখলেন। দেখেই কিন্তু ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। লোকটাই ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল।

ঠিক লোক নয়। নৃসিংহ অবতার। শরীরটা মানুষের মতো বটে, কিন্তু মুখটা সিংহের।

মৃদঙ্গবাবু চিঁচিঁ করে বললেন, আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

নৃসিংহ অবতার গভীর গলায় বলল, বাঁচতে চাইলে আমার সঙ্গে চলুন! নইলে পুলিশের হাত এড়াতে পারবেন না। আপনার বংশের মুখে কালি পড়বে।

কথাটা অতি সত্যি। মৃদঙ্গবাবু সভয়ে বললেন, আপনি কে?

আমি যেই হই, সেটা বড় কথা নয়। তবে আপনাকে চুপিচুপি বলে রাখি গয়েশবাবুর কিন্তু সত্যিই লেজ ছিল।

বলেন কী?

প্রমাণ চান তো আমার সঙ্গে চলুন। আমার মুখোশটাকে ভয় পাবেন না। আমার মুখটা দেখতে ভাল নয় বলে মুখোশ পারি। এখন চলুন।

মৃদঙ্গবাবু উত্তেজিত গলায় বললেন, চলুন।

'এই দিকে আসুন।' বলে নৃসিংহ অবতার মৃদঙ্গবাবুর হাত ধরে কোমরাজল ভেঙে উত্তরদিকে এগোতে লাগিল।

লোকটা ঘাঁতঘোঁত জানে। দিব্যি লোকজনের চোখের আড়াল দিয়ে, পুলিশের নাগাল এড়িয়ে জল ভেঙে একটা নিরিবিলি জায়গায় এনে ডাঙায় তুলল।

জায়গাটা মৃদঙ্গবাবু চেনেন। এক সময়ে এখানে নীলকুঠি ছিল। ভাঙা পোড়ো একখানা মস্ত বাড়ি আজও আছে। বিশাল বিশাল বটগাছ ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। চারধার। পারতপক্ষে লোকে এখানে আসে না। এখানে নাকি ভীষণ বিষাক্ত সাপের আড্ডা।

ডাঙায় তুলে লোকটা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, এবার জিনিসটা দিয়ে দিন।

মৃদঙ্গবাবু আঁতকে উঠে বললেন, মানে?

ন্যাকামি করবেন না মৃদঙ্গবাবু। গয়েশবাবুর বাড়িতে যে-জিনিসটা পেয়েছেন, সেটা দিয়ে দিন।

কিছু পাইনি তো!

লোকটা হঠাৎ জামার ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে বলল, বেশি কথা বললে খুলি উড়ে যাবে।

মৃদঙ্গবাবু জীবনে কখনও বন্দুক পিস্তলের মুখোমুখি হননি। আতঙ্কে 'আঁ আঁ' করে উঠলেন।

লোকটা বলল, গয়েশবাবুর যে লেজ ছিল, সে-প্রমাণ আমার কাছে আছে। যদি সেটা চান তো জিনিসটা দিয়ে দিন।

মৃদঙ্গবাবু হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে ছিলেন। হাঁ-মুখের মধ্যে একটা মাছি ঢুকে মুখের ভিতরে দিব্যি একটু বেড়িয়ে আবার বার হয়ে এল।

কই, দিন। লোকটা তাড়া দেয়।

কী রকম জিনিস?

একটা লকেট। তেমন দামি জিনিসেরও নয়। পেতলের।

মা কালীর দিব্যি, লকেটটা আমি পাইনি।

ন্যাকামি হচ্ছে?

না না। তবে আমার মনে হয়, লকেটটা সুমন্তবাবু পেয়েছেন।

ঠিক জানেন?

জানি। উনিও ওসময়ে ঘুরঘুর করছিলেন।

উনি কোথায়?

পালিয়েছেন। জলে নেমে সাঁতার দিয়ে পালিয়েছেন। পালানোর ভঙ্গি দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিছু একটা হাতিয়ে এনেছেন গয়েশবাবুর বাড়ি থেকে।

আচ্ছা, সুমন্তবাবুর সঙ্গেও মোলাকাত হবে। এখন আপনি যেতে পারেন।

যাব? ভয়ে ভয়ে মৃগঙ্কবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

যান। কিন্তু পুলিশের কাছে কিছু বলবেন না।

না না। পুলিশের সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। আমি এখন দিশেরগড়ে মাসির বাড়ি যাব। মাসখানেকের মধ্যে আর ফিরছি না।

এই বলে মৃদঙ্গবাবু তাড়াতাড়ি রওনা হলেন। কিন্তু দশ পাও যেতে হল না তাঁকে। পিছন থেকে কী যেন একটা এসে লাগল মাথায়।

মৃদঙ্গবাবু উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। নৃসিংহ অবতার এগিয়ে এল। মৃদঙ্গবাবুর মাথার কাছেই ঘাসের ওপর পড়ে থাকা বলটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরল। তারপর দ্রুত হাতে মৃদঙ্গবাবুর শরীর তল্লাশ করতে লাগল।

যা খুঁজছিল, তা পেয়েও গেল লোকটা। তারপর হোগলার বনে নেমে জলের মধ্যে চোখের পলকে মিলিয়ে গেল।

সুমন্তবাবু প্রথমটায় প্রাণপণে সাঁতরে ঝিলের অনেকটা ভিতর দিকে চলে গেলেন। পুলিশের ভয়ে সাঁতারটা একটু তেজের সঙ্গেই কেটেছেন। ফলে বেদম হয়ে হাঁফাতে লাগলেন।

সাঁতার জিনিসটা খারাপ নয়, তিনি জানেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সাঁতার হল শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম; কিন্তু ব্যায়ামেরও তো একটা শেষ আছে। আজ সকালেই সুমন্তবাবু অনেকটা দৌড়েছেন, ওঠবোস করেছেন, বৈঠকি মেরেছেন। তার ওপর এই সাঁতার তাঁর শরীরের জোড়গুলোয় খিল ধরিয়ে দিল। জলও বেজায় ঠাণ্ডা।

ঝিলের মোঝমধ্যিখানে পৌঁছে সুমন্তবাবু একবার পিছু ফিরে দেখে নিলেন। না, নিশ্চিন্ত। অনেকটা দূরে চলে এসেছেন। এত দূর থেকে ঝিলের পারটা ধু-ধু দেখা যায়, কিন্তু লোকজন চেনা যায় না।

সুমন্তবাবু সাঁতার থামিয়ে চিত হয়ে ভেসে রইলেন কিছুক্ষণ। মৃদঙ্গবাবুর কী হল তা বুঝতে পারছেন না। লোকটা বায়োলজির পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনে বায়োলজিটাই তো সব নয়। সাঁতার জানলে আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হত না।

চোখে প্রখর সূর্যের আলো এসে পড়ছে! সুমন্তবাবু চোখ বুজলেন। জলে চিত হয়ে ভেসে থাকাও যে খুব সহজ কাজ তা নয়। একটু-আধটু হাত-পা নাড়তে হয়। কিন্তু সুমন্তবাবুর হাত-পা ভীষণ ভারী হয়ে এসেছে।

একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন সুমন্তবাবু, ডাঙা অনেক দূর। ভয়ে সাঁতার দিয়ে এত দূর চলে এসেছেন বটে, কিন্তু ফের এতটা সাঁতরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। যদিও ফিরে যেতে পারেন, তাহলেও লাভ নেই। পুলিশে ধরবে।

সুমন্তবাবু ধীরে-বীরে ফের সাঁতরাতে লাগলেন। তিনি শুনেছেন, জলার মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো জায়গা আছে। তার কোনও একটাতে বসে যদি একটু জিরিয়ে নিতে পারেন তাহলে সন্ধের মুখে ধীরে-সুস্থে ফিরে যেতে পারবেন। কপাল ভাল থাকলে একটা জেলে-নৌকোও পেয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়ার পরই সুমন্তবাবুর দম আটকে আসতে লাগল। হাত-পা লোহার মতো ভারী। শরীরটা আর কিছুতেই ভাসিয়ে রাখতে পারছেন না। দুপুরে ভাল করে খাওয়াও হয়নি। শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে।

সুমন্তবাবু গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন, বাঁচাও! বাঁচাও! আমি ডুবে যাচ্ছি।

কিন্তু কেউ সে ডাক শুনতে পেল না।

এর চেয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই বুঝি ভাল ছিল। সুমন্তবাবু মনে মনে মৃদঙ্গবাবুকে একটু হিংসেই করতে লাগলেন। সাঁতার না শিখেই তো লোকটা বেঁচে গেল।

হঠাৎ একটা ছপছপ। বৈঠার শব্দ হল না? নাকি ভুল শুনছেন?

সুমন্তবাবুঘাড় ঘোরালেন। বুকটা আনন্দে ধপাস ধপাস করতে লাগল। ভুল শোনেননি। বাস্তবিকই একটা নৌকো তাঁর দিকে আসছে। ছোট্ট নৌকো।

বাঁচাও! বলে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন সুমন্তবাবু।

নৌকো থেকে একটা লোক মোলায়েম গলায় বলল, আপনাকে বাঁচাতেই তো আসা।

বটে! বলে সুমন্তবাবু নৌকোর গলুইটা ধরতে হাত বাড়ালেন। অমনি একটা বৈঠা এসে খাঁচাত করে বসে গেল বাঁ। কাঁধে। সুমন্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বাপ রে

নৌকো থেকে একটা লোক মোলায়েম গলায় বলল, অতি তাড়াহুড়ো করবেন না। আমার দু-একটা কথা আছে।

ব্যথায় সুমন্তবাবু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন। ককিয়ে উঠে বললেন, আমি যে ডুবে যাচ্ছি।

বৈঠাটা ধরে ভেসে থাকুন।

মন্দের ভাল। সুমন্তবাবু বৈঠাটা চেপে ধরলেন। বললেন, কী কথা?

গয়েশবাবুর বাড়িতে চোরের মতো ঢুকেছিলেন কেন?

সুমন্তবাবু অবাক হয়েও সামলে গেলেন। নৌকের নীচে থেকে লোকটার মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। সূর্যের আলোটাও চোখে এসে পড়ছে সরাসরি। তবু মনে হল নৌকোর ওপরে যে লোকটা বসে আছে তার মুখটা মানুষের মুখ নয়। মনে হচ্ছে যেন একটা মানুষের মতো হাত-পা-বিশিষ্ট সিংহ বসে আছে।

সুমন্তবাবু ভয় খেলেন। নির্জন ঝিলের জলে তাঁকে মেরে ডুবিয়ে দিলেও সাক্ষী কেউ নেই, কাঁপা গলায় বললেন, ঠিক চোরের মতো নয়, চোরের মতো ঢুকেছিলেন মৃদঙ্গবাবু।

উনি কেন ঢুকেছিলেন জানেন?

বললেন তো গয়েশবাবুর লেজ খুঁজতে?

লেজ কি পেয়েছেন উনি?

তা বলতে পারি না। গয়েশীবাবুর যদি লেজ থেকেও থাকে তবু সেটা তিনি ফেলে যাওয়ার লোক নন।

আপনি কেন ঢুকেছিলেন?

সুমন্তবাবু অম্লান বদনে বললেন, আমি ঠিক ঢুকিনি। পল্টুর খোঁজে লোক জড়ো হয়েছে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম, মৃদঙ্গবাবু চুপি চুপি গয়েশবাবুর বাড়িতে ঢুকছেন। তাই ওঁকে ফলো করে আমিও ঢুকে পড়ি। তারপর একটা ঘরে বসে বই পড়তে থাকি। হঠাৎ আমাকে চোর বলে সন্দেহ করে মৃদঙ্গবাবু আমার ওপর লাফিয়ে পড়েন।

সিংহের মুখটাকে ভাল করে লক্ষ করছিলেন সুমন্তবাবু। তাঁর সন্দেহ হল, ওটা মুখ নয়, মুখোশ; তবে খুব নিখুঁত মুখোশ। একেবারে সত্যিকারের সিংহের মুখ বলেই মনে

হয়।

লোকটা বলল, বৈঠাটা শক্ত করে ধরুন।

সুমন্তবাবু কাতর স্বরে বলেন, নৌকোয় উঠব না?

না, ডাঙা অল্প দূরেই। আমি সেখানে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যাব।

আমি বাড়ি যাব। আমার যে খিদে পেয়েছে।

খিদে আমারও পেয়েছে। তাতে কী?

খিদে পেলে আমি ভীষণ রেগে যাই।

তা যান না। রাগ তো পুরুষের লক্ষণ।

সুমন্তবাবুর বাস্তবিকই রাগ হচ্ছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন, আপনি কে?

আমি নৃসিংহ অবতার।

সুমন্তবাবু আর কথা বললেন না। তাঁর মনে হল, তিনি আসল অপরাধীর পাল্লায় পড়েছেন। উচ্চবাচ্য করা উচিত হবে না।

নৌকোটা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একটা বৈঠা তিনি ধরে আছেন, আর লোকটা আর-একটা বৈঠা মেরে নৌকোটাকে নিপুণ ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, লোকটা চমৎকার নৌকো বায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা সুমন্তবাবু পায়ের নীচে জমি পেয়ে গেলেন। এবং উঠে দাঁড়ালেন।

লোকটাও নৌকো থামিয়েছে। বলল, এবার আসুন তাহলে। সামনেই ডাঙা জমি।

সুমন্তবাবু দেখলেন জঙ্গলে-ছাওয়া একটা পুরনো চর। অনেকটা দ্বীপের মতোই। তবে জনমনিষ্যি নেই।

সুমন্তবাবু কোমরসমান জলে দাঁড়িয়ে দ্বীপটা একটু দেখলেন। বৈঠার ডগাটা এখনও হাতে ধরা।

লোকটা একটু হেসে বলল, রাতটা কোনওমতে কাটিয়ে দিন। ভোরবেলা সাঁতার শুরু করলে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবেন বাড়িতে।

সুমন্তবাবুর মাথাটা চড়াক করে উঠল রাগে। একে পেটে খিদে তার ওপর এসব টিপ্পনী তাঁর সহ্য হওয়ার নয়। তিনি হঠাৎ এক ঝটিকায় বৈঠাটায় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মোচড় মারলেন।

ব্যায়ামের আশ্চর্য সুফল। লোকটা সেই টানে বেসামাল হয়ে নৌকোর মধ্যেই উপুড় হয়ে পড়ল।

সুমন্তবাবু একলফে নৌকোয় উঠে লোকটার ঘাড়ে সামিল হয়ে দুটো প্রচণ্ড রাদ্দা কষলেন।

কিন্তু মুশকিল হল, জলে ভিজে এবং নানারকম ব্যায়ামের ফলে তাঁর শরীরে আর সেই শক্তি নেই। উপরন্তু নৃসিংহ অতিকায় বলবান লোক। কোনওরকম গা-জোয়ারির মধ্যেই গেল না। শুধু টপ করে উঠে বসল।

তার পিঠ থেকে পাকা ফলের মতো খসে ফের জলে পড়ে গেলেন সুমন্তবাবু!

লোকটা বৈঠা তুলে নিয়ে এক ঠেলায় নৌকোটা গভীর জলে নিয়ে ফেলল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল, ডাঙায় উঠে পড়ুন সুমন্তবাবু। জলায় কুমির আছে।

সুমন্তবাবু দুই লাফে ডাঙায় উঠে কোমরে হাত দিয়ে বেকুবের মতো চেয়ে দেখলেন, নৃসিংহ অবতার নৌকো নিয়ে ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুমন্তবাবু এবার চারদিকটা ভাল করে দেখলেন। দ্বীপটায় বড় গাছ নেই বললেই হয়। আগাছাই বেশি। ফলমূল খেয়ে যে খিদে মেটাবেন, সে উপায় নেই।

ভেজা গায়ে বাতাস লেগে খুব শীত করছিল সুমন্তবাবুর। গরম বালির ওপর বসে শীতটা খানিক সামাল দিলেন। বেলা আর খুব বেশি অবশিষ্ট নেই। জেলে-নৌকোর টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না! সুতরাং এই দ্বীপেই রাতটা কাটাতে হবে।

দিনের আলো থাকতে-থাকতেই দ্বীপটা ঘুরে দেখবেন বলে ক্লান্ত শরীরেও সুমন্তবাবু উঠে পড়লেন।

জায়গাটা খুব বড় নয়। জলের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে হাঁটতে-হাঁটতে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন তিনি।

হঠাৎ আতঙ্কে থমকে দাঁড়ালেন সুমন্তবাবু। সামনেই বালির ওপর একটা, দুটো, তিনটে, চারটি কুমির চুপচাপ শুয়ে আছে। ভারী নিরীহ দেখতে। কিন্তু সাক্ষাৎ যম।

সুমন্তবাবু খুব দ্রুতপায়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বুকটা ধকধক করছে ভয়ে। পায়ে গোটাকয়েক কাঁটা ফুটল প্যাট-প্যাট করে। তবু শব্দ করলেন না। কুমির যদি ধেয়ে আসে?

কিন্তু ঝোপজঙ্গলগুলোও খুব বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছিল না তাঁর। এই ছোট দ্বীপে বাঘ-ভালুক বা হায়না-নেকড়ে নেই ঠিকই, কিন্তু অন্যবিধ প্রাণী থাকতে পারে। বিপদের কথা ভাবতে-ভাবতে আপনা থেকেই সুমন্তবাবু কয়েকটা বুকডন আর বৈঠকি দিয়ে ফেললেন। কিন্তু ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বেদম শরীরের হাড়গুলো সেই অনাবশ্যক ব্যায়ামে। মটমট করে উঠল, পেশীগুলো 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়তে লাগল। সুমন্তবাবু নিরস্ত হয়ে মাটিতে বসে হাঁফাতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর কাঁধের ওপর একটা গাছের ডগা খুব ধীরে ধীরে নেমে এল। বাঁ কাঁধে একটা হিমশীতল স্পর্শ পেলেন। চমকে উঠে তাকাতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সবুজ রঙের একটা সরু সাপ খুব স্নেহের সঙ্গে তার হাত বেয়ে খানিকদূর এসে মুখের দিকে যেন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে।

লাউডগা সাপ বিষাক্ত কি না তা তিনি ভাল জানেন না। কিন্তু এত কাছে, একেবারে নাকের ডগায় সাপের মুখোমুখি তিনি কখনও হননি।

বাঁচাও! বাপ রে; বলে একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে সুমন্তবাবু মুর্চ্ছা গেলেন।

পল্টু ধীরে ধীরে চোখ খুলল। মাথার পিছন দিকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, শরীরটা ভারী কাহিল। চোখ খুলে সে চারদিকে চেয়ে যা দেখল, তা মোটেই খুশি হওয়ার মতো নয়।

পিছনে জঙ্গল, সামনে জল। দুপুর পেরিয়ে সূর্য একটু হেলেছে। বাড়ি ফেরার কোনও উপায় নেই।

নিজের অবস্থাটা বুঝবার একটু চেষ্টা করল পল্টু। ধীরে ধীরে উঠে বসল। যে লোকটা তাকে এখানে এনে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে গেছে, সে খুবই বুদ্ধিমান। পল্টুকে সে ইচ্ছে করেই খুন করেনি। কারণ জানে, এই নির্জন জনমানবশূন্য জায়গায় পড়ে থেকে না-খেতে পেয়েই সে মরবে। নইলে বুনো জন্তু-জানোয়ার বা সাপখোপ তো আছেই।

মাথাটা ঝন ঝন করছে বটে, তবু পল্টু উঠে ধীরে-ধীরে জলের কাছে নেমে এসে প্রথমে ব্যথার জায়গাটায় ঠাণ্ডা জল চাপড়ালো। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিল। খানিকটা খেয়েও নিল।

একটু সুস্থ ও স্বাভাবিক বোধ করার পর সে আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটা বলেছিল ওই জঙ্গলের মধ্যেই পালের গোদাটি আছে। পল্টুকে সে-ই আনিয়েছে এখানে। কিন্তু কথাটা পল্টুর এখন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

জঙ্গল-টঙ্গল দেখে তার অভ্যাস নেই। তবু যদি বাঁচতে হয় তবে এই জঙ্গলই এখন একমাত্র ভরসা। যদি কিছু ফল-টল পাওয়া যায় তো খেয়ে বাঁচবে। আর যদি কাঠ-টাঠ দিয়ে একটা ভেলাটেলা বানানো যায় তো জলাটা পেরোনো যাবে। যদিও দ্বিতীয় প্রস্তাবটা তার সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না।

জঙ্গলে ঢোকার এমনিতে কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে পল্টু একটা সরু গুড়িপথ দেখতে পেল। আগাছার মধ্যে যেন একটা ফোকর। নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। সামনেটা যেন আধো অন্ধকার একটা টানেল।

পল্টু সাহস করে ঢুকল, এবং হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে নানারকম অদ্ভুত শব্দ। কখনও অদ্ভুত গলায় কোনও পাখি ডেকে ওঠে, পোকামাকড় ঝিঁ ঝিঁ বোঁ বোঁ কন্টর মটর নানারকম আওয়াজ দেয়। মাঝে মাঝে পায়ের তলা দিয়ে সাঁত করে যেন কী সরে যায়।

খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎ জঙ্গলটা একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। সে চারধারে চেয়ে দেখল, অনেকগুলো বড় বড় গাছ কাটা হয়েছে। চারদিকে গাছের গুড়ি আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে আছে। পল্টুর বুক আনন্দে কেঁপে ওঠে। এখানে কাঠুরিয়ারা আসে।

জায়গাটা পেরিয়ে আবার এগোয় পল্টু। আচমকাই তার চোখে পড়ে চমৎকার একটা পেয়ারা গাছ। ফলে ঝেঁপে আছে। সে কলকাতার ছেলে, গাছ বাইতে শেখেনি। কিন্তু এ গাছটা বেশ নিচু এবং ফলগুলো হাত বাড়িয়েই পাড়া যায়।

গোটাকয়েক পেয়ারা খেয়ে পল্টুর গায়ে আবার জোর-বল ফিরে এল। চারদিকে তাকিয়ে জঙ্গলটা দেখছিল সে। তেমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে না আর জায়গাটাকে। সে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখল। মনে হচ্ছিল, এ-জায়গাটা একটু অন্যরকম। চারদিকে ভাঙা ইট পড়ে আছে। একটা পুরনো পাথুরে ফোয়ারা কাত হয়ে পড়ে আছে। এখানে নিশ্চয়ই কারও বাড়িঘর ছিল।

পায়ে পায়ে আর-একটু এগোতেই পল্টু দেখতে পেল বাড়িটা। ঠিক বাড়ি নয়, ধ্বংসস্তুপ। তবে কয়েকটা খিলান খাড়া আছে এখনও। ধ্বংসস্তুপটার পাশেই একটা খোড়ো ঘর দেখে পল্টু অবাক হয়ে গেল। এখানে কি কেউ থাকে? কিন্তু কে? সেই পালের গোদা লোকটা নয় তো?

ঘরটা দেখে একই সঙ্গে পল্টু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বোধ করতে থাকে। শেষ অবধি আকর্ষণই জয়ী হয়। দেখাই যাক না।

খোড়ো ঘরটার দরজা নতুন কাঁচা কাঠের তৈরি। কোনও হুড়কো-টুড়কো নেই। ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে দুটো কুড়ুল বেড়ার গায়ে দাঁড় করানো। অন্য ধারে তক্তা দিয়ে বানানো একটা চৌকির মতো জিনিস। তাতে একটা মাদুর পাতা। ঘরে কেউ থাকে বা বিশ্রাম নেয়। কিন্তু এখন সে নেই।

পল্টু কুড়ুল দুটোর একটা হাতে তুলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, মনে হয়, ঘরে যে থাকে সে কাঠুরিয়াই। তবে আত্মরক্ষার জন্য হাতের কাছে কুড়ুলটা রাখা ভাল।

তক্তপোশটার ওপর বসে পল্টু পকেট থেকে আর একটা পেয়ার বার করে খেতে লাগল।

কোথাও কোনও শব্দ হয়নি। আচমকাই দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

পল্টু চিৎকার করার জন্য হাঁ করেছিল। কিন্তু শব্দ বেরোল না। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা দৈত্য বিশেষ। তালগাছের মতো ঢাঙা, বিপুল স্বাস্থ্য, দুই ঘন ভ্রূর নীচে কঠিন একজোড়া চোখ।

কয়েকটা মুহূর্তকে যেন কত যুগ বলে মনে হচ্ছিল পল্টুর কাছে।

হঠাৎ লোকটা খুব নরম ভদ্র গলায় বলল, ভয় পেও না। তুমি কে?

পল্টু শ্বাস ছেড়ে কাঁপা গলায় বলল, আমি পল্টু।

শহরে থাকো?

হাঁ।

কার বাড়ি?

পরেশ রায় আমার মামা।

লোকটা বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। গায়ে একটা হাতকটা জামা, পরনে ধুতি, পায়ে টায়ার কেটে বানানো চপ্পল। লোকটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল পল্টু।

লোকটা হাতের টাঙ্গি গোছের জিনিসটা বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, এখানে এলে কী করে? নৌকোয়?

আমি ইচ্ছে করে আসিনি। একটা মুখোশধারী লোক আমাকে এখানে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, ঘটনাটা কি আমায় খুলে বলবে?

পল্টুর ভয় কেটেছে একটু। লোকটার চেহারা যেমন, স্বভাব হয়তো তেমন খারাপ নয়। সে ধীরে ধীরে বলতে লাগিল।

আগাগোড়া দরজার গায়ে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর মুখে লোকটা সব শুনল। কোনও কথা বলল না। পল্টুর গল্প শেষ হওয়ার পর মিনিট দুয়েক চুপ করে কী

ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, গয়েশবাবুর সঙ্গে আগের রাতে কি সত্যিই তোমার দেখা হয়েছিল?

পল্টু মাথা নেড়ে বলল, হয়েছিল। উনি আমার কাছে এসেছিলেন।

ভ্রূ কুঁচকে লোকটা জিজ্ঞেস করল, কেন?

একটা জিনিস আমাকে রাখতে দিতে এসেছিলেন।

জিনিসটা কী?

কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট। আমি দোতলার ঘরে থাকি। মাঝরাতে আমার জানালায় ঢিল পড়ে। আমি জানালা খুলে দেখি, নীচে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে হাতছানি দিয়ে নীচে ডাকলেন। আমি নীচে গিয়ে দরজা খুলতেই উনি প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, খুব সাবধানে এটা তোমার কাছে লুকিয়ে রেখো। আমি ক'দিন পরে এসে নিয়ে যাব!

তুমি প্যাকেটটা খুলেছিলে?

না। গয়েশবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। উনি আমাকে বিশ্বাস করতেন।

লোকটা আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, প্যাকেটটা কি খুব ভারী?

খুব। সিঁড়ি দিয়ে ওটা নিয়ে উঠবার সময় আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে।

লোকটা আবার মাথা নাড়ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পল্টু কাঠুরিয়া কখনও দেখেনি ঠিকই, কিন্তু এই লোকটার হাবভাব গেঁয়ো বা অশিক্ষিত লোকের মতো যে নয়, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল। তাই ফশ করে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

আমি কাঠুরিয়া।

কিন্তু আপনাকে দেখে কাঠুরিয়া বলে মনে হয় না।

লোকটা একটু হাসল। বলল, যে কাঠ কাটে তাকে তো কাঠুরিয়াই বলে।

পল্টুর সন্দেহ গেল না। তবে সে কথাও আর বাড়াল না। লোকটা কী যেন ভাবছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আপনমনে বলল, ব্যাপারটা বড় জট পাকিয়ে গেছে।

কোন ব্যাপারটা?

তুমি যে ব্যাপারটার কথা বললে।

লোকটা কী যেন ভাবছে। ভাবতে ভাবতেই বলে, পারবে। এ জায়গাটা এমন কিছু দুর্গম নয়। প্রায়ই লোকজন যাতায়াত করে। কাঠুরিয়া আসে, মউলিরা আসে, জেলেরা আসে।

আপনি কি এখানেই থাকেন?

মাঝে-মাঝে থাকতে হয়।

ভয় করে না?

না। ভয় কিসের? জঙ্গলে যেমন বিপদ আছে, শহরেও তেমনি আছে। বরং বেশিই আছে।

আপনি কি শুধু কাঠই কাটেন? আর কিছু করেন না?

করি। আমাকে চারধারে নজর রাখতে হয়।

তার মানে?

লোকটা কথাটার জবাব দিল না। আবার ভাবতে লাগিল। মুখখানা খুব গম্ভীর।

দূরে একটা ঘুঘু পাখি ডাকছিল। লোকটা হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শুনে নিয়ে পল্টুর দিকে চেয়ে বলল, আমি একটু আসছি। তুমি কোথাও যেও না।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

একটা ঘুঘু ডাকছে। ঘুঘুটা আমার পোষা। কেন ডাকছে দেখে আসি।

লোকটা বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে।

পল্টু এক সেকেন্ড অপেক্ষা করেই লাফ দিয়ে উঠে। ছুটে গেল দরজায়। পাল্লাটা একটু ফাঁক করে দেখল, লোকটা ধ্বংসস্তুপটা পার হয়ে লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

পল্টু বুঝতে পারছিল না, লোকটা কে বা কেমন। তবে এ যে কাঠুরিয়া নয়। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুখোশধারী বলেছিল তাদের সর্দার এই দ্বীপে থাকে। এই লোকটা সত্যিই সেই সার্দার নয় তো! ব্যাপারটা জানা দরকার।

পল্টু গাছের আড়াল-আবড়াল দিয়ে লোকটার পিছনে চলতে লাগল। কিন্তু লোকটা জঙ্গলে চলাফেরায় অভ্যস্ত পল্টু নয়। উপরন্তু তাকে গা ঢাকা দিয়ে চলতে হচ্ছে। বারবার লোকটাকে হারিয়ে ফেলছিল পল্টু। তবে বেশিদূর যেতে হল না। মিনিট দুয়েক হাঁটার পরেই পল্টু দেখল সামনেই খাঁড়ি। দৈত্যের মতো লোকটা একটা গাছের ধারে থেমেছে। খাঁড়িতে একটা সবুজ রঙের ছোট্ট মোটরবোট থেকে একজন লোক ডাঙায় নেমে লোকটার দিকে উঠে আসছে।

লোকটার মুখ দেখে পল্টুর বুকের মধ্যে রেলগাড়ির পোল পার হওয়ার মতো গুম গুম শব্দ হতে লাগল। চোখের পলক পড়ল না। লোকটার মুখে সিংহের মুখোশ।

পল্টুর ভিতর থেকে আপনা আপনিই একটা আতঙ্কের চিৎকার উঠে আসছিল। মুখে হাতচাপা দিয়ে সে চিৎকারটাকে আটকাল। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, মুখোশধারী কাঠুরিয়ার সঙ্গে কী যেন কথা বলছে।

খুব সামান্যক্ষণই কথা বলল তারা। মুখোশধারী আবার মোটরবোটে ফিরে গেল। তারপর বোটের মুখ ঘুরিয়ে জল কেটে চলে গেল কোথায়। বোটটার মোটরে খুব সামান্য একটু শব্দ হচ্ছিল। বোধহয় খুবই দামি মোটরবোট।

কাঠুরিয়া কয়েক সেকেন্ড মোটরবোটটার গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল।

আর এবারই হঠাৎ ভয় পেল পল্টু। দারুণ ভয়। সে বুঝতে পারল, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সে মুখ ঘুরিয়ে দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে জানে না। কী হবে জানে না। শুধু মনে হচ্ছে, পালানো দরকার। এক্ষুনি পালানো দরকার।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দৌড়োনো সহজ নয়। পদে পদে অজস্র বাধা, কাঁটাগাছ, লতা, ঝোপঝাড়, কী নেই। বার দুই পড়ে গেল পল্টু।

পিছন থেকে একটা হেঁড়ে গলার হাঁক শোনা গেল। হঠাৎ, পল্টু! পল্টু! পালিও না। ভয় নেই।

পল্টু। আরও আতঙ্কে দিশহারা হয়ে দৌড়োতে গিয়ে দিক হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ দেখল সামনে তার পথ আটকে সেই কাঠুরিয়া দাঁড়িয়ে।

পল্টুর গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। নিস্পলক আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

কাঠুরিয়া একটা হাত বাড়িয়ে বলল, অত ভয় পেলে কেন? মুখোশধারীকে দেখে? ওকে ভয়ের কিছু নেই। যে তোমাকে এখানে এনেছে, সে ও লোকটা নয়।

তাহলে ও কে?

ও আমার বন্ধু। এসো, কিছু ভয়ের নেই।

আমি যাব না।

লোকটা হেসে ফেলল। সরল হাসি। বলল, তোমার মতো ছোট্ট একটু ছেলেকে ইচ্ছে করলেই তো আমি মেরে ফেলতে পারি, যদি আমার সেই মতলব থাকে। তাই না? তবু যখন মারছি না তখন নিশ্চয়ই আমার সে মতলব নেই।

তাহলে?

তাহলে কিছু নয়। আমার সঙ্গে এসো, সব বলছি।

পল্টু লোকটার হাত ধরল। লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তাকে বলল, এই দ্বীপটার একাধারে নদী, অন্যধারে বড় ঝিল। নদী থেকে ঝিলে ঢুকবার পথ আছে। আমি এখানে সেই পথটা পাহারা দিই।

কেন?

লক্ষ করি করা ওই পথে যাতায়াত করে।

আর ওই মোটরবোটের লোকটা?

ও লোকটাও পাহারা দেয়। সারাক্ষণ তো একজনের পক্ষে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। ও আমাকে সাহায্য করে।

আপনি তাহলে কাঠুরিয়া নন?

কাঠুরিয়াও বটে। তবে শুধু কাঠুরিয়া নাই।

আপনি কি পুলিশের লোক?

অনেকটা তাই।

পাহারা দেন কেন?

কিছু দুষ্ট লোক এই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। ওই মুখোশওলা লোকটা কি সত্যিই আমাকে এখানে আনেনি?

না; ও তোমাকে চেনেও না। তবে যে তোমাকে এখানে এনেছে সে খুব চালাক লোক।

কেন?

সে জানে যে, তুমি মরবে না। শহরে ফিরেও যাবে। গিয়ে বলবে যে, একজন সিংহের মুখোশ-পরা লোক তোমাকে চুরি করে এনেছিল। তখন দোষটা গিয়ে পড়বে আমার ওই বন্ধুটির কাঁধে। কারণ এই অঞ্চলে যে-সব কাঠুরিয়া, জেলে আর মাউলি যাতায়াত করে তারা সবাই আমাকে আর আমার বন্ধুকে চেনে, তারা জানে আমার বন্ধু একটা মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়।

আপনার বন্ধু মুখোশ পরে কেন?

এমনিতে কোনও দরকার নেই। খানিকটা শখ বলতে পারো। আর একটা উদ্দেশ্য হল, যেসব দুষ্ট লোক এখান দিয়ে আনাগোনা করে তারা যাতে ওকে চিনে না রাখতে পারে।

কিন্তু মুখোশ দেখলে তো লোকের সন্দেহ আরও বাড়বে।

কাঠুরিয়া খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। বলল, বাঃ! তোমার তো খুব বুদ্ধি! কথাটা ঠিক বলেছ। তবে আমার ওই বন্ধুটির মুখটা দেখতে বিশেষ ভাল নয়। ছেলেবেলায় আগুনে পুড়ে মুখটা একটু বীভৎস হয়ে গেছে। ফলে ও মুখোশ ছাড়া বেরোতে চায় না। ওর অবশ্য নানারকম মুখোশ আছে। তবে সিংহের মুখোশটাই ও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

তারা খোড়ো ঘরটার কাছে পৌঁছে গেল হাঁটতে হাঁটতে।

কাঠুরিয়া ঘরে ঢুকে বলল, চুপচাপ বসে বিশ্রাম নাও। আমার বন্ধুটি ফিরে এলে তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

আপনার বন্ধু কোথায় গেল?

একজন জেলে আমার বন্ধুকে খবর দিয়েছে, সিংহের মুখোশ-পরা একটা লোক একটা নৌকোয় করে জলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু আগেও তাকে দেখা গেছে। পশ্চিম ধারের একটা দ্বীপের কাছে। আমাদের মনে হয়, লোকটা ওখানেই কোনও কীর্তি করে এসেছে। আমার বন্ধু সেখানে গেল দেখে আসতে।

তাহলে মুখোশধারী দু' নম্বর লোকটা কে?

সে নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু নয়।

আপনি তাকে চেনেন না?

কী করে চিনিব? তবে আমার ধারণা, লোকটা খুব অচেনাও নয়।

সে এসব করছে কেন?

বললাম যে, সে আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। পুলিশ যখনই খবর পাবে যে, একজন মুখোশধারী একটা বাচ্চা ছেলেকে গুম করে এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল, তখনই খোঁজখবর এবং তল্লাশ শুরু হবে। আমাদের হদিস পেতে পুলিশের মোটেই দেরি হবে না। তারা এসে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আপনারাও তো পুলিশের লোক?

তা অনেকটা বটে। কিন্তু আমরা সাধারণ পুলিশ নই। আমাদের কাছে আইডেনটিটি কার্ড বা কোনও প্রমাণপত্র থাকে না। কাজেই ধরতে এলে প্রমাণ করতে পারব না যে, আমরা অপরাধী নই।

তাহলে কী হবে? আপনাদের জেল হবে?

কাঠুরিয়া হেসে মাথা নেড়ে বলল, তা অবশ্য হবে না। ধরা পড়ার পর আমরা আমাদের হেড কোয়াটারে ব্যাপারটা জনাব।

সেখান থেকে আমাদের আইডেনটিফাই করা হলে পুলিশ আমাদের ছেড়েও দেবে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে যাবে।

কী হবে?

মুখোশধারী কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এখান থেকে সরাতে চাইছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যও যদি আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই ফাঁকে সে মস্ত একটা কাজ হাসিল করে নেৰে।

কী কাজ হাসিল করবে? সেইটে জানার জন্যই তো আমরা এখানে বেশ কিছুদিন হয়। থানা গেড়ে বসে আছি।

পুলিশ কি আপনাদের ধরবেই?

আমি ফিরে গিয়ে না হয় কিছু বলব না।

কাঠুরিয়া মাথা নেড়ে বলল, তুমি না বললে কী হয়! দ্বিতীয় মুখোশধারী বোকা লোক নয়। সে যা করেছে তা দিনের আলোতেই করেছে। নিজেকে খুব একটা গোপন রাখেনি। জলায় সর্বদাই জেলেদের নৌকো ঘোরে। তাদের চোখে পড়বেই। তুমি না বললেও তারা বলে দেরে। সুতরাং পুলিশ যে আসবেই তাতে সন্দেহ নেই।

হঠাৎ আবার আগেকার মতোই দূরে ঘুঘুর ডাক শোনা গেল। লোকটা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। তারপর পল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, এসো।

পল্টু উঠে পড়ল। বলল, কিছু পাওয়া গেছে ওই দ্বীপে?

মনে তো হচ্ছে। চলো দেখি।

খাঁড়ির মুখে এসে তারা দেখে, মুখোশধারী মোটরবোট থেকে পাঁজাকোলা করে একটা লোককে নামিয়ে আনছে। লোকটাকে দেখে পল্টু চেঁচিয়ে উঠল, আরো! এ যে সান্টুর বাবা?

কাঠুরিয়া বলল, চেনো তাহলে!

খুব চিনি।

মুখোশধারী সুমন্তবাবুকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, একটুর জন্য লোকটাকে সাপে কামড়ায়নি। কিন্তু লোকটা একটু অদ্ভুত। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, হাতে একটা লাউডগা সাপ বাইছিল। সাপটাকে তাড়িয়ে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই দুম করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুষি চালাতে লাগল। তাই বাধ্য হয়ে আমি লোকটার চোয়ালে একটা ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিই। তারপর নিয়ে আসি।

কাঠুরিয়া পল্টুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, বুঝলে?

'না।' বলেই পল্টু আবার তাড়াতাড়ি বলল, বুঝেছি। আপনার বন্ধুকে সুমন্তবাবু আমার মতো সেই দ্বিতীয় মুখোশধারী বলে মনে করেছিল।

ঠিক বলেছ। দু' নম্বর মুখোশধারী খুব কাজের লোক।

পল্টু উদ্বেগের সঙ্গে বলে, আচ্ছা, গয়েশবাবুকেও কি মুখোশধারীই সরিয়ে দিয়েছে?

খুব সম্ভব।

উনি কি বেঁচে আছেন?

সেটা বলা শক্ত।

লোকে বলছে ওঁকে খুন করা হয়েছে।

কঠুরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটাই স্বাভাবিক। গয়েশবাবুর ঘটনাটাই সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছে।

কাঠুরিয়ার মুখোশধারী বন্ধু খাঁড়ি থেকে একটা মগে করে জল এনে সুমন্তবাবুর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সুমন্তবাবুর চোখ পিটপিট করতে লিাগল।

কাঠুরিয়া মৃদুস্বরে বলল, বিনয়, তুমি সামনে থেকে না। তোমাকে দেখলেই আবার ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে।

মুখোশধারী বোধহয় মুখোশের আড়ালে একটু হাসল। তারপর নেমে গিয়ে তার মোটরবোটের মুখ ঘুরিয়ে আবার জলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমন্তবাবু চোখ পিটপিট করে কাঠুরিয়াকে একটু দেখে নিয়েই হঠাৎ তবে রে? বলে একটা হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। কাঠুরিয়া একটুও নড়ল না। সুমন্তবাবু দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে নিজেই বসে পড়লেন। তারপর হঠাৎ পটং পটাং করে কয়েকটা বৈঠক এবং বুকডন দিয়ে নিতে লাগলেন।

এবার আত্মপ্রকাশ করা বিধেয় ভেবে প'ষ্ট্র এগিয়ে গিয়ে মিষ্টি করে বলল, কাকাবাবু, কোনও ভয় নেই। ইনি আমাদের শত্রু নন।

সুমন্তবাবু একটা বুকডনের মাঝখানে থেমে হাঁ করে পল্টুর দিকে চেয়ে রইলেন।

কাঠুরিয়া তাঁকে ধরে তুলল। তারপর বলল, আমি কখনও মারপিট করিনি। আপনি মারলে আমার খুব ব্যথা লাগত। আমি তো শত্রু নই, বন্ধু।

ফের সেই খোড়া ঘরটায় ফিরে এল তারা। সঙ্গে সুমন্তবাবু। কাঠুরিয়া তাঁকে শুকনো একটা ধুতি আর একখানা কম্বল দিল গায়ে দেওয়ার জন্য। কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে চিড়ে, গুড়, মর্তমান কলা দিয়ে খাওয়াল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই ঘটনাটা বলে গেলেন সুমন্তবাবু।

কাঠুরিয়া চুপ করে শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল, মৃদঙ্গবাবুর কী হল সে খবর কি জানেন?

সুমন্তবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না। বোধহয় পুলিশে ধরেছে।

কাঠুরিয়া চুপ করে ভাবতে লাগল।

বাইরে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। পাখিরা ফিরে আসছে নিজেদের বাসায়। তাদের কিচির-মিচির শব্দে বনভূমি মুখর। সন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা বাড়তে লাগল। জলার জল ছুঁয়ে উত্তুরে বাতাস এল হু হু করে। শীতে সুমন্তবাবু আর পল্টু কাঁপতে লাগল। কিন্তু কাঠুরিয়া নির্বিকার।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কাঠকুটো জেলে ঘরের মধ্যে একটা চমৎকার আগুন তৈরি করল কাঠুরিয়া। তারপর পল্টুকে বলল, আমার বন্ধু একটা জরুরি কাজ সেরে আসতে গেছে। তোমাকে সে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারত, কিন্তু তার আর দরকার নেই। খবর পেয়েছি, পুলিশ এখানে আসছে। তারা এলে তুমি তাদের সঙ্গেই ফিরে যেতে পারবে।

আর আপনি?

কাঠুরিয়া একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমার পালিয়ে যাওয়ার পথ আছে। কিন্তু পালিয়ে লাভ নেই।

কেন?

পালালে পুলিশের হাত এড়াতে পারব বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে পাহারার কাজেও ফাঁক পড়বে। দু' নম্বর মুখোশধারী আমাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছে।

কেন, আমি পুলিশকে বলব যে, এ কাজ আপনার বন্ধু করেনি।

কাঠুরিয়া মাথা নেড়ে বলল, তোমার কথা তারা বিশ্বাস করবে: না। কারণ আমার ধারণা, মৃদঙ্গবাবুও সেই মুখোশধারীর পাল্লায় পড়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়েছেন।

তাহলে উপায়?

কোনও উপায় দেখছি না। কয়েক ঘণ্টার জন্য পাহারার কাজে ফাঁক পড়বেই।

হঠাৎ সুমন্তবাবু একটা হুংকার দিলেন, না, পড়বে না।

আমি পাহারা দেব। কী করতে হবে শুধু বলুন।

কাঠুরিয়া একটু হাসল। বলল, কাজটা খুব শক্ত, ভীষণ শক্ত। তাছাড়া আপনার বাড়ির লোকও তো আপনার জন্য ভাবছেন।

সুমন্তবাবু ম্লান মুখে বললেন, তা ভাবছে বটে। কিন্তু আমার বাড়ি ফেরার উপায় নেই। গয়েশের বাড়িতে আনঅথরাইজড অনুপ্রবেশের দরুন বজ্রাঙ্গ আমাকে ধরবেই।

আমাদের বংশে কেউ কখনও পুলিশের খাতায় নাম লেখায়নি মশাই। তার চেয়ে বরং গুণ্ডা বদমাসদের সঙ্গে লড়াই করে জীবন বিসর্জন দেওয়াও শ্রেয়। না, আমিই পাহারা দেব। কী করতে হবে শুধু বলুন।

পল্টুর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। সেও বলে উঠল, আমিও বাড়ি ফিরব না; পাহারা দেব।

কাঠুরিয়া চিন্তিতভাবে সুমন্তবাবুকে বলে, আপনি আর পল্টু দুজনের কারওই এসব বিপজ্জনক কাজে অভিজ্ঞতা নেই। যদি শেষ অবধি আপনাদের কিছু হয়?

সুমন্তবাবু খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা বৈঠক দিয়ে বুকডন মারতে মারতে বললেন, মরার চেয়ে বেশি আর কী হবে মশাই?

কাঠুরিয়া বলে, মরলেই তো হবে না, কাজটাও উদ্ধার করা চাই।

কাজটার কথাই বলুন। আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে না।

কাঠুরিয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি মোটরবোট চালাতে পারেন?

সুমন্তবাবু বললেন, না, তবে নৌকো বাইতে পারি। তাহলেও হবে। আপনি নদী আর ঝিলের মাঝখানকার খাঁড়িটা নিশ্চয়ই চেনেন।

খুব চিনি মশাই, এখানেই তো জীবনটা কাটল।

কাঠুরিয়া বলল, লোকটা ওই খাঁড়ি দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়বে। নদীতে পড়লে তাকে ধরা মুশকিল হবে। সে বোধহয় খুবই ভাল নৌকো চালায়।

লোকটা যাবে কোথায়?

লোকটা নদীর স্রোতে পড়লে অনেকদূর অবধি ভাঁটিতে চলে যাবে। তারপর সম্ভবত কোনও মোটরলঞ্চ বা ছোট্ট স্টিমার তাকে তুলে নেবে।

আপনি তাহলে পুরো ষড়যন্ত্রটাই জানেন?

ঠিক জানি না। তবে আন্দাজ করছি। গয়েশবাবুকে খুন করার পিছনে উদ্দেশ্য একটাই। লোকজনকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। সকলের মনোযোগ এখন গয়েশবাবুর দিকে। আজ সারা রাত ধরে জেলেরা জলায় তাঁর লাশ খুঁজবে। সেই ফাঁকে একটা ছোট্ট নৌকো খাঁড়ি বেয়ে নদীতে পড়ল কিনা কে অত নজর রাখে। আর রাখবেই বা কেন? কিন্তু লোকটা জানে, আর কেউ নজর না রাখলেও আমরা রাখছি। তাই আমাদের সরিয়ে দেওয়ার চমৎকার একটা প্ল্যান করেছে। সে। এখন শুধু নজর রাখছে কখন পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যায়।

সুমন্তবাবু হঠাৎ বললেন, জলপথেই বা সে পালাবে কেন? স্থলপথও তো আছে। ট্রেনে উঠে যদি পালায়?

তাহলে তার লাভ নেই। জলপথে যত সহজে স্বদেশের সীমা ডিঙোনো যায় স্থলপথে তত নয়। তা ছাড়া স্থলপথে নজর রাখারও লোক আছে। কিন্তু সে সেদিক দিয়ে পালাবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। ওই খাঁড়িটাই তার একমাত্র পথ। আমাদের একটা ডিঙি নৌকোও আছে। আপনি আর পল্টু সেটা নিয়ে খাঁড়ির মুখটা পাহারা দেবেন, পারবেন?

পারব। কিন্তু লোকটাকে চিনিব কী করে?

সম্ভবত তার মুখে এবারও সিংহের মুখোশ থাকবে। যদি তা না থাকে, তবে কী করবেন তা বলতে পারব না। তবে নজর রাখবেন। ওই বোধহয় পুলিশের নৌকো এল।

বাস্তবিকই দূরে অনেক লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। জঙ্গল ভেঙে ভারী পায়ের এগিয়ে আসার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

কাঠুরিয়া উঠে পড়ল। বলল, ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাঁ দিকে এগিয়ে যান। দশ মিনিট হাঁটলেই খাঁড়ি।

কাঠুরিয়া কুলুঙ্গি থেকে একটা টর্চ আর একটা বেতের লাঠি নামিয়ে সুমন্তবাবুকে দিয়ে বলল, পল্টুকে দেখবেন।

ঠিক আছে। চলি।

সুমন্তবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি-কি-মারি করে বাঁদিকে হাঁটতে লাগলেন। সঙ্গে পল্টু। পিছনে পুলিশের তীব্র টর্চের আলো জঙ্গল ভেদ করে এদিকে-সেদিকে পড়ছে। দুজনে আরও জোরে হাঁটতে থাকে।

জঙ্গলের এবড়ো-খেবড়ো জমিতে টক্কর খেতে খেতে দুজনে খাঁড়ির ধারে পৌঁছে গেল। নদীতে ভরা জোয়ার। খাঁড়ি দিয়ে তীব্র স্রোত হুহুংকারে ঝিলের মধ্যে ঢুকছে। সেই স্রোতের ধাক্কায় মোচার খোলার মতো একটা ডিঙি নৌকা দোল খাচ্ছে তীরে।

জয় দুর্গা! জয় দুর্গতিনাশিনী! বলে একটা হুংকার ছাড়লেন সুমন্তবাবু।

পল্টু সতর্ক গলায় বলল, কাকাবাবু! আস্তে। বজ্রাঙ্গবাবু শুনতে পেলে--

সুমন্তবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি দু হাত জড়ো করে কপালে আর বুকে ঘন ঘন ঠেকাতে ঠেকাতে বিড়বিড় করে বললেন, জয় বজরঙ্গবলী। জয় রাম। জয় অসুরদলনী।

দুজনে চুপ করে বসে রইলেন নৌকোয়। কুয়াশা আজ বেশ পাতলা। তার ভিতর দিয়ে দূরে দূরে জেলে-নৌকোর বহু আলো দেখা যাচ্ছে। এখনও গয়েশবাবুর লাশের খোঁজ চলছে।

খাঁড়ির মুখ পাহারা দেওয়া এমনিতে শক্ত নয়। মাত্র পঞ্চাশ হাতের মতো চওড়া জায়গাটা। তবে এখন জোয়ারের সময় জলের তোড় কিছু বেশি। কোনও নৌকোকে নদীতে যেতে হলে বেশ কসরত করতে হবে। কিন্তু দুজনেই জানে, দু-নম্বর মুখোশধারী নৌকো বাওয়ায় দারুণ ওস্তাদ লোক! এই স্রোত ঠেলে নৌকো নিয়ে নদীতে পড়তে তার বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া অন্ধকার মতো আছে, কুয়াশা আছে। মুখোশধারী নিশ্চিত আলো জ্বেলে আসবে না। কাজেই দুজনে খুব তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখতে লাগল।

প্রচণ্ড শীত। তার ওপর মাঝে মাঝে ডিঙির গায়ে ঢেউ ভেঙে জল ছিটকে আসছে গায়ে। সুমন্তবাবু আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছেন। পল্টু খোলের মধ্যে খানিক সেঁধিয়ে হিহি করে কাঁপছে।

ধীরে ধীরে সময় কেটে যেতে লাগল। জোয়ারের স্রোতাটাও যেন ধীরে ধীরে কমে এল একটু।

সুমন্তবাবু বললেন, শীতে জমে গেলাম রে পল্টু! আয়, একটু গা গরম করি।

কী ভাবে কাকু?

'নৌকো বেয়ে।' বলে সুমন্তবাবু পারে নেমে খুঁটি থেকে ডিঙির দাড়টা খুলে দিয়ে উঠে বৈঠা হাতে নিলেন।

নৌকো সুমন্তবাবু ভালই চালান। স্রোত ঠেলে দিব্যি বার দুই খাঁড়ির এপার ওপার হলেন। তারপর বললেন, নাঃ; আজ আর হতভাগা আসবে না।

হঠাৎ চাপাস্বরে পল্টু বলল, আসছে।

বলিস কী? বলেই সুমন্তবাবু বৈঠা রেখে নৌকোর মধ্যেই গোটা দুই বৈঠকি দিয়ে নিতে গেলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকোটা বোঁ বোঁ করে চরকির মতো দুটো পাক খেল।

বাবা গো! পল্টু ভয় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সুমন্তবাবু চোখের পলকে আবার বৈঠা তুলে নৌকো সামাল দিয়ে বললেন, কোথায় রে? কই?

আপনি সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছেন কাকু। ওই তো দূরে। ওই যে!

বাস্তবিকই কিছু দূরে একটা কালো বস্তুকে জলে ভেসে আসতে দেখা গেল।

সুমন্তবাবু সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোর গলা শুনেছে?

পল্টু ফিস ফিস করে বলল, কে জানে? তবে বাতাস উল্টোদিকে বইছে। নাও শুনতে পারে।

জয় মা! বলে কপালে বারকয়েক হাত ঠেকালেন সুমন্তবাবু!

নৃসিংহ অবতার নৌকোর ভেলকি দেখাতে পারে। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, ছোট নৌকোটা তীরের মতো গতিতে ছুটে আসছে। খাঁড়ির স্রোত কমলেও যা আছে তাও বেশ তীব্র। সেই স্রোত ঠেলে ওরকম গতিতে চলা খুব সোজা কাজ নয়।

পল্টু বলল, আসছে কাকু! এসে গেল!

ও বাবা! তাহলে আর দুটো বৈঠকি দিয়ে নেব নাকি?

সর্বনাশ! ও কাজও করবেন না। নৌকো বানচাল হয়ে যাবে।

সুমন্তবাবু 'জয় মা, জয় মা' বলে বিড়বিড় করতে লাগলেন। বিপরীত দিক থেকে নৌকোটা বিশ হাতের মধ্যে চলে এল। বৈঠার ছলাত ছলাত শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল।

পল্টু জিজ্ঞেস করল, ককু, এবার কী করবেন?

চিন্তিত সুমন্তবাবু বললেন, তাই তো ভাবছি। একটা বন্দুক থাকলে--

যখন নেই তখনকার কথা ভাবুন।

লাঠিটা দে।

লাঠি দিয়ে নাগাল পাবেন না। তাহলে তুই একটা বৈঠা জলে ডুবিয়ে নৌকোটা সামলে রাখি। আমি আর একটা বৈঠা দিয়ে ঘা কতক দিই লোকটাকে।

পারবেন?

'জয় মা!' বলে সুমন্তবাবু বৈঠা নিয়ে খাড়া হলেন। কিন্তু পল্টুর অনভ্যস্ত হাতে নৌকোটা স্থির থাকছে না। টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে। সুমন্তবাবু ঝড়াক করে খোলের মধ্যে পড়ে গেলেন। আবার উঠলেন।

তা করতে করতে নৌকোটা পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল। কিন্তু নৃসিংহ-অবতার খুবই বুদ্ধিমান। একটা নৌকো যে খাঁড়ির মুখ আগলাচ্ছে তা লক্ষ করেই আচমকা নিজের

নৌকোটাকে চোখের পলকে দশ হাত তফাতে নিয়ে ফেলল সে। তারপর নদীর দিকে প্রাণপণে এগোতে লাগল।

সুমন্তবাবু বুঝলেন, সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে। পল্টুর হাত থেকে বৈঠাটা টেনে নিয়ে তিনি দু হাতে প্রাণপণে বাইতে লাগলেন। টপটপ করে ঘাম ঝরতে লাগল তার এই শীতেও। ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁ, একেই বলে একসারসাইজ! এই হল একসারসাইজ!

নৃসিংহ অবতারের নৌকোটার কাছাকাছি এগিয়ে গেল সুমন্তবাবুদের ডিঙি। এই জায়গায় জলের স্রোত এখনও ভীষণ। দুটো ডিঙির কোনওটাই তেমন এগোতে পারছে না। তবু তার মধ্যেই নৃসিংহ-অবতারের ডিঙি কয়েক হাত এগিয়ে যেতে পেরেছে এবং আরও এগিয়ে যাচ্ছে!

সুমন্তবাবু চেঁচালেন, খবরদার! থামো বলছি! নইলে গুড়িয়ে দেব!

নৃসিংহ-অবতার কোনও জবাব দিল না। কিন্তু দু হাতে চমৎকার বৈঠা মেরে নৌকোটাকে প্রায় নাগালের বাইরে নিয়ে ফেলল।

তবে রে বলে সুমন্তবাবু দুই হাতে প্রায় ঝড় তুলে ফেললেন বৈঠার ঘায়ে। ছোট্ট ডিঙিটো ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দুটো লাফ মেরে ব্যাংবাজির মতো ছিটকে নৃসিংহ অবতারের নৌকোকে ছুঁয়ে ফেলল। সুমন্তবাবু সঙ্গে-সঙ্গে একটা বৈঠা তুলে দড়াম করে বসালেন গলুইয়ে বসা লোকটার মাথায়।

কিন্তু কোথায় মাথা। চতুর লোকটা চোখের পলকে নৌকোটাকে একটা চরকিবজি খাইয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে। বৈঠা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সুমন্তবাবু টাল সামলাতে না পেরে গুপুস করে জলে গিয়ে পড়লেন।

পল্টু নিজের বিপদ আন্দাজ করে আগে থেকেই তৈরি ছিল। সুমন্তবাবুর সঙ্গে নৌকোয় চড়া যে কতটা বিপজ্জনক, তা সে অনেকক্ষণ আগেই বুঝে গেছে। সুতরাং নৃসিংহের নৌকোর গলুইতে তাদের গলুই ঠেকাতেই সে টুক করে ওই নৌকোয় লাফিয়ে চলে গেছে। নৃসিংহ তখন নৌকো সামলাতে ব্যস্ত। তাই দেখেও তেমন কিছু করতে পারল না।

পল্টু দেখল, তাদের ডিঙিটা স্রোতের মুখে নক্ষত্রবেগে ওলট-পালট খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে। তবে সুমন্তবাবু বীর-বিক্রমে সাঁতার দিয়ে আসছেন।

মুখে সিংহের মুখোশ পরা লোকটা একটা বৈঠা তুলল। সুমন্তবাবুর মাথাটাই তার লক্ষ্য সন্দেহ নেই। পল্টু আর দেরি করল না। একটা ডাইভ দিয়ে সে সোজা নৃসিংহের কোলে গিয়ে পড়ল। তারপর দুই হাতে চালাতে লাগল দমাদম ঘুষি।

কিন্তু পল্টুর ঘুষিতে কাবু হওয়ার লোক নৃসিংহ নয়। হাতের এক ঝটিকায় পলুকে ছিটকে ফেলে লোকটা আবার বৈঠা তুলে চোখের পলকে সুমন্তবাবুর মাথা লক্ষ করে চোলল। কিন্তু সুমন্তবাবু এবার খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে টুক করে ডুব দিলেন।

নৃসিংহের নৌকোটা বৈঠার সাহায্য না পেয়ে স্রোতের মুখে একটু পিছিয়ে গেল। আর পলুও ফের উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল নৃসিংহের ওপর। দুহাতে সে লোকটার গলা খামচে ধরল।

নৃসিংহ ভারী জ্বালাতন হয়ে বলে উঠল, উঃ! ছাড়ো, ছাড়ো!

নৌকোটা ফের একটা চক্কর মারল। আর ততক্ষণে গলুই ধরে সুমন্তবাবু ঝপাত করে নৌকোয় উঠে পড়লেন।

নৌকোটা পুরো বেসামাল হয়ে পিছন দিকে দৌড়োতে থাকে।

কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে সুমন্তবাবু পল্টুকে সরিয়ে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লোকটার ওপর। রাগে তাঁর গা রি-রি করছে। বৈঠাটা মাথায় লাগলে এতক্ষণে তাঁর সলিল-সমাধি হয়ে যেত। তার ওপর এই লোকটাই তাঁকে আজ সাপ আর কুমিরের মুখে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। এবং সম্ভবত এই লোকটাই গয়েশের খুনী।

সব রাগ গিয়ে লোকটার ওপর পড়ায় সুমন্তবাবুর ঘুষির জোর গেল বেড়ে। তাঁর দু-দুখানা হাতুড়ির মতো ঘুষি খেয়ে লোকটা নেতিয়ে পড়ল গলুইতে।

গোলমতো একটু চাঁদ উঠেছে আকাশে। নৌকোটা চক্কর খেতে খেতে আর পিছিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ধারের কাছে অগভীর জলে বালির মধ্যে ঘষটে থেমে গেল।

হাঃ হাঃ করে টারজানের মতো কোমরে হাত দিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন সুমন্তবাবু। ভেজা খালি গা, কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দে তাঁর শীতবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে তিনি পল্টুর দিকে চেয়ে বললেন, তুই ঠিক আছিস তো পল্টু?

পল্টু সুমন্তবাবুর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে কনুইতে বেশ ব্যথা পেয়েছে। তবু চিঁচিঁ করে বলল, আছি।

আয় এবার লোকটার মুখোশ খুলে দেখি ঘুঘুটি কে।

এই বলে সুমন্তবাবু নিচু হয়ে নৃসিংহের মুখোশটা এক টানে খুলে ফেললেন।

তারপরেই হঠাৎ তারস্বরে। 'ভূত! ভূত!' ভূতৎ বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এক লাফে জলে নেমে দৌড়োতে দৌড়োতে সুমন্তবাবু ডাঙায় উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পল্টুও মুখখানা দেখতে পেয়েছিল। 'বাবা গো' বলে আর্তনাদ করে সেও চোখ বুজে ফেলল।

আর ঠিক এইসময়ে ভুটভুট আওয়াজ করতে করতে একটা মোটরবোট তীব্র বেগে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে। সন্ধানী আলো এসে পড়ল পল্টুর চোখে-মুখে।

সেই খোড়ো ঘরটায় আবার আগুন জ্বেলেছে কাঠুরিয়া। এবার আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসেছে অনেকগুলো লোক। বিনয়, সুমন্তবাবু, বজাঙ্গ, পল্টু, মৃদঙ্গবাবু, সান্টু, মঙ্গল, পরেশ, কবি সদানন্দ এবং কয়েকজন সেপাই। অপরাধীকে নিয়ে কয়েকজন সেপাই ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে মোটরবোটে। দ্বিতীয় খেপে এরা সবাই যে যাঁর বাড়ি ফিরে যাবেন।

কাঠুরিয়া বলছিল, জ্যান্ত লোক কি কখনও ভূত হয় সুমন্তবাবু?

তা বলে লোকটা যে গয়েশ তা কী করে বুঝব?

কাঠুরিয়া একটু হেসে বলল, লোকটা যে গয়েশ তা আমরা অনেকদিন ধরেই জানি। কিন্তু এই অতি বুদ্ধিমান লোকটির বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি এতদিন। অথচ ভারতবর্ষের বিভিন্ন দামি পুরাকীর্তি ইনি অনেকদিন ধরেই বাইরে চালান দিয়ে আসছেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি এঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। ইদানীং হঠাৎ একদিন টের পেলেন, এ ব্যবসা বেশিদিন চালানো অসম্ভব। অনেক এজেন্ট, অনেক লোকের কাছে পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। এরা যে-কেউ একদিন মুখ খুলবে। ব্যবসা চালানোর আর প্রয়োজনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ টাকা হাতে এসে গেছে। তাই শেষ দাঁওটি মেরেই ব্যবসা গুটিয়ে পালিয়ে এলেন নিজের শহরে। কিন্তু এই শেষ দাঁওটিই ছিল মারাত্মক। বিজাপুরের বিষ্ণুমূর্তি। খাঁটি সোনার ওপর নানা দামি পাথর বসানো বলে এর দাম বহু লক্ষ টাকা। কিন্তু পুরাকীর্তি হিসেবে এর আন্তর্জাতিক বাজারে দাম দশ লক্ষ ডলারের কাছাকাছি। গয়েশবাবু এই অত্যধিক দামি জিনিসটা না পারছিলেন। হজম করতে, না ওগরাতে। আমাদের লোক ওঁর পিছু নিয়েছিল। তিনি তাও টের পেয়েছিলেন। এদিকে বিদেশে চিঠি লেখালিখি করে একজন ভাল খদেরও পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জিনিসটা হস্তান্তর করতে পারছিলেন না। একমাত্র উপায় হচ্ছে জলপথ। গয়েশবাবু নিজের বাড়ির পিছনের জলায় নিয়মিত নৌকো বাইতেন এবং অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে মাল পাচার করবার নিরাপদ পথটা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে আমি আর বিনয় এই জঙ্গলে থানা গেড়ে ফেলেছি। সিংহের মুখোশ পরা বিনয়কে গয়েশবাবু বহুবার মোটরবোটে ওঁর পিছু নিতে দেখেছেন। আমরা ওঁকে ভড়কে দেওয়ার জন্যই বেশি। আত্মগোপন করতাম না। ভড়কালেই সুবিধে। মানুষ ঘাবড়ে গেলে নানারকম ভুলভ্রান্তি করে।

উনি অবশ্য কাঁচা অপরাধী নন। অনেক ভেবেচিন্তে প্ল্যান করলেন। বিদেশের খদ্দেরকে চিঠি লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। লোকটা ওই নদীতে খুব দ্রুতগামী মোটরলঞ্চ রাখবে। ও ব্যাপারে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর নির্ধারিত দিনটিতে প্রথমে নিজে গায়েব হয়ে সকলকে সচকিত করে তুললেন। আর সেই গোলমালে সবাই যখন একদিকে তাকিয়ে আছে, তখন উনি অন্য দিকে কাজ। সারতে চাইলেন। গায়েব হওয়ার রাত্রেই পল্টুর কাছে বিষ্ণুমূর্তিটা গচ্ছিত রেখে আসেন। পরদিন পল্টুকে গুম করার পর যখন তার বাড়ির লোক থানাপুলিশ করে বেড়াচ্ছে, আর ঝিলের জলে খোঁজা হচ্ছে পাটুর দেহ, তখন তার বাড়ি থেকে বিষ্ণুমূর্তি সরিয়ে নিলেন। তার পরের ইতিহাস তো আপনাদের জানা।

কিন্তু আমাদের কৃতিত্ব সামান্যই। গয়েশবাবুকে বিমল ধরার জন্য সব কৃতিত্ব প্রাপ্য সুমন্তবাবুর আর পল্টুর।

সুমন্তবাবু বললেন, কী যে বলেন! গয়েশকে কাবু করতে দুটো ঘুষি চালাতে হয়েছে সেটাই তো লজ্জার কথা। একটা ঘুষিতেই কত হওয়া উচিত ছিল। নাঃ, কাল থেকে আরও ব্যায়াম, আরও ব্যায়াম...

বিমর্ষ মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই হল, কিন্তু আসল জিনিসটাই মাঠে মারা গেল যে।

কাঠুরিয়া বলল, কী সেটা?

গয়েশবাবুর লেজ নেই।

সবাই হেসে উঠল। দূরে নিশুত রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভুটভুট করে একটা মোটরবোটের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগিল। গয়েশবাবুর নৌকের পাটাতনের তলা থেকে উদ্ধার করা বিষ্ণুমূর্তিটা তক্তাপোশের ওপর রাখা। আগুনের আভায় ঝকমক করছে। যেন বিষ্ণু হাসছেন।